অপরাধ ও অপরাধী

চরিত্র ও চিকিৎসা

ডঃ সুকুমার বসু

অপরাধ
ও
অপরাধী

অপরাধ মানুষের সামাজিক জীবনেরই ঘটনা। আমাদের আচরণের একটি বিকৃত রূপ অপরাধীর আচরণে দেখতে পাওয়া যায়। অপরাধের জন্ম মনে। দণ্ডিত ব্যক্তির মনের নাগাল পেলে তার দণ্ডভোগের রীতিনীতিতে পরিবর্তন ঘটিয়ে তার আচরণকে সমাজানুগ করে তোলা সম্ভব।

বিজ্ঞান-চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ মানুষ আজ বিজ্ঞানসম্মত প্রচেষ্টায় অপরাধের কারণ অনুসন্ধানের কাজে নিযুক্ত। তাই দুরূহ অপরাধ-কর্মগুলির সন্ধানসূত্র আজ আর তাঁদের কাছে অনায়ত্ত নয়।

এই গ্রন্থে অপরাধ ও অপরাধী সম্পর্কিত আলোচনায় লেখক সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও অন্যান্য ফলিত বিজ্ঞানের যে অসাধারণ প্রয়োগনৈপুণ্য দেখিয়েছেন তা যে-কোন অনুসন্ধিৎসুর কাছে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রহস্য-উপন্যাসের মতই চিত্তাকর্ষক বলে মনে হবে। পার্থক্য এই—রহস্য উপন্যাসে কল্পিত কাহিনীর সমাবেশ, আর এই গ্রন্থ বহু চিত্র ও তথ্যে সমৃদ্ধ বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনায় পূর্ণ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
ডঃ কমলকুমার মুখার্জি,
শ্রীসুজিতকুমার শেঠ,
শ্রীসুহৃদগোপাল দত্ত।

সূচী ঃ

অপরাধ
ও
অপরাধী

ডঃ সুকুমার বসু, এম. এস-সি., পি. এইচ-ডি.,
রীডার, ফলিত মনোবিজ্ঞান বিভাগ,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

সম্পাদনা ঃ
পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩৮২

প্রথম সংস্করণ : এক হাজার
আশ্বিন, ১৩৮২ : অক্টোবর, ১৯৭৫

প্রকাশক :
ডি. মেহ্‌রা
রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট : কলকাতা ৭০০ ০১২
৯৪ সাউথ মালাকা : এলাহাবাদ ২১১ ০০১
১০২ প্রসাদ চেম্বার্স : অপেরা হাউস : বোম্বাই ৪০০ ০০৪
৩৮৩১ পাতৌদি হাউস রোড : দরিয়াগঞ্জ : দিল্লী ১১০ ০০৬

প্রচ্ছদ শিল্পী :
অরুণ ঘোষ

মুদ্রক :
জয়ন্ত বাক্‌চি
পি. এম. বাক্‌চি অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড
মুদ্রণ বিভাগ
১৯ গুলু ওস্তাগর লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৬

দাম :
বারো টাকা

উৎসর্গ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত
মনোবিজ্ঞান বিভাগের রূপায়ক,
বিভাগীয় প্রধান
এবং
আমার শিক্ষক
ডক্টর সরোজেন্দ্রনাথ রায়
শ্রদ্ধাস্পদেষু
২৪।৯।৭৫

ভূমিকা ঃ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত মনোবিজ্ঞান বিভাগের রীডার ডক্টর সুকুমার বসুর 'অপরাধ ও অপরাধী' শীর্ষক গবেষণামূলক পুস্তকটি পড়িয়া আনন্দলাভ করিলাম। ডক্টর বসুর গভীর অভিজ্ঞতা এই বিষয়টিকে প্রাণ দিয়াছে। তাঁহার লেখা ও দৃষ্টিভঙ্গী খুবই আকর্ষণীয়। গ্রন্থখানিতে নয়টি অধ্যায় আছে।—প্রাচীন ভারতের অপরাধ বিজ্ঞান, অপরাধ সমীক্ষা, অপরাধ ও অপরাধী, অপরাধ অনুসন্ধান, তদন্ত ও আনুষঙ্গিক প্রস্তুতি, তদন্তকার্যে তথ্যানুসন্ধান, অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরাধী, বিশেষ দণ্ডনীয় আচরণ এবং মনোবিজ্ঞানে অপরাধ প্রসঙ্গ—ইহাই বিষয়বস্তুর নয়টি অধ্যায়। প্রতিটি অধ্যায়ে ডক্টর বসুর মৌলিক অবদান আছে।

বাংলা ভাষায় এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়া গ্রন্থকার দেশের ও দশের যথার্থ উপকার করিয়াছেন। এই বিষয়ে এইরূপ সমগ্র দৃষ্টিসম্পন্ন পুস্তক খুবই বিরল। ভাষা অতি সহজ ও সরল হওয়ার জন্য পুস্তকটি সুপাঠ্য হইয়াছে। ভারতের আদর্শ আধুনিক মনোভাবের সহিত সংযুক্ত হইয়া বিষয়টিকে উদ্দীপিত করিয়াছে।

পুস্তকখানি পড়িয়া অনেক প্রশ্নই মনে জাগে। প্রথম প্রশ্ন হইল—অপরাধ কি ও অপরাধী কাহাকে বলে? দ্বিতীয় প্রশ্ন হইল—অপরাধী কে? তৃতীয় প্রশ্ন—শাস্তি কাহাকে বলে ও তাহার মাত্রা ও উদ্দেশ্য কি? চতুর্থ প্রশ্ন—দণ্ডদাতার দায়িত্ব। একটি সুস্থ, সবল ও প্রগতিশীল সমাজ গঠন করিতে হইলে কিরূপ দণ্ডবিধি ও তাহার প্রশাসন হওয়া উচিত—ইহাই হইল শেষ প্রশ্ন। বিষয়টি লইয়া বিদগ্ধ সমাজে আধুনিক সময়ে বহু আলোচনা ও গবেষণা চলিতেছে। এই সকল প্রশ্নের যথাযথ সমাধান সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া হওয়াই সমীচীন—গ্রন্থকারের পুস্তকটি পড়িলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

আর একটি বিশেষ সমস্যা, আধুনিক সময় বিশেষ জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে। নূতন নূতন অপরাধ সৃষ্টি হইতেছে। ইহা ভাবিবার বিষয়। আজকে রেশন কিনিতে হইলে, জিনিস-পত্তর কিনিতে হইলে, জমিজমা কিনিতে হইলে, গাড়ী চালাইতে হইলে, আয়কর দিতে হইলে, জিনিস

বিক্রয়ের কর দিতে হইলে, ব্যাবসা চালাইতে হইলে, বাড়ী করিতে হইলে, নানান্ রকম আইনের সীমানার ভিতর চলিতে হইবে। যাহার ব্যতিক্রম হইলে দণ্ডনীয় ব্যবস্থার মধ্যে পড়িতে হইবে। ইহার উপর কালোবাজার ও অযথা মুনাফা গ্রহণ বিশেষভাবে দণ্ডনীয়। এই রকম বহু প্রকার অপরাধের সৃষ্টি হইয়াছে যাহা বিগতকালে অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত না। উপরন্তু খাদ্য ও ঔষধে ভেজালের জন্য বহু দণ্ডনীতির প্রবর্তন করা হইয়াছে। এই সকল বিভিন্ন অপরাধে অপরাধীদের শাস্তির বিধান কি?—একটি বিরাট প্রশ্ন। ইহা ছাড়া শ্রমিক ও মালিক সংক্রান্ত বহু আইন রচিত হইয়াছে যাহাতে দণ্ডের বিধিও আছে। আধুনিক পরিস্থিতিতে ঘেরাও একটি সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা কি দণ্ডনীয়—এ প্রশ্নও উঠিয়াছে। সন্দেহের উপর ভিত্তি করিয়া বিনা বিচারে আটক আর একটি আধুনিক দণ্ডনীতির বৈশিষ্ট্য। এইরূপে বহু সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে নূতন নূতন দণ্ডের বিধান হইয়াছে। ইহার যথার্থ ও প্রকৃত সমাধান আজ দেশের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন।

উপসংহারে তাই আজ মনে হয় অতীতের কথা যা বর্তমানেও প্রযোজ্য। শেক্সপীয়রের রচনা বিশেষতঃ ম্যাক্‌বেথ; ইব্‌সনের নাটক, প্যাভলভের মনোবিজ্ঞান ও শারীরিক প্রক্রিয়া, এবং ভিক্টর হিউগোর লা মিজারেবেলের জিন্ ভলজিনের কথা মনে পড়ে। এই সকল মনীষিগণ সবাই এ বিষয়ে সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন। প্রবৃত্তির বশে ও তাড়নায় মানুষ দেবতা হয় বা পিশাচ হয়। সেই প্রবৃত্তিকে কিভাবে সমাজানুগ করা যায় তাহাই এই গ্রন্থে গ্রন্থকারের আলোচ্য বিষয়। এ প্রশ্ন আজকের নয়, বহুদিনের। এ প্রশ্নে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—“প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহং কিং করিষ্যতি।” আমাদের আজকের প্রকৃতি বিকৃতিতে দাঁড়াইয়াছে। তাই সবচেয়ে সেরা প্রশ্ন এ বিষয়ে হইল—কি করিয়া প্রকৃতিকে শুদ্ধ করা যায়।

শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়
পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি।

সোমবার
১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮২।

প্রাচীন ভারতের অপরাধ বিজ্ঞান*

প্রাচীন ভারতের অপরাধ, অপরাধী এবং দণ্ডনীতি সম্পর্কে প্রামাণ্য বিবরণ পাওয়া যায় স্মৃতিশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থগুলি থেকে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্মার্ত পণ্ডিতদের রচিত গ্রন্থ এবং টীকাকারদের ভাষ্য ছাড়া কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এ বিষয়ে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। সামাজিক সুস্থতা অক্ষুণ্ণ রেখে মানুষের জীবনযাত্রাকে আধ্যাত্মিক সাধনার উপযোগী করে তোলবার জন্যে প্রাচীন ভারতের যে সমস্ত মনীষী বিভিন্ন নীতি এবং বিধান প্রণয়ন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, অস্তম্ভ, গৌতম, শুক্রাচার্য, কৌটিল্য, বশিষ্ঠ, কাত্যায়ন, বিষ্ণু, বর্ধমান, বাৎসায়ন, চণ্ডেশ্বর, নারদ, মেধাতিথি, বিজ্ঞানেশ্বর প্রমুখ পণ্ডিতদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উল্লিখিত মনীষিগণের রচিত গ্রন্থগুলির রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব তৃতীয়াব্দের শুরু থেকে চার শ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই গ্রন্থগুলি ছাড়াও রামায়ণ, মহাভারত, সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিভিন্ন নাটক, সংহিতা, বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ, শিলালিপি এবং বিদেশী পর্যটকগণের বিবরণ থেকেও অনেক মূল্যবান তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে প্রাক্-বৈদিক যুগের সমাজব্যবস্থায় শান্তি ও শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে নীতি এবং দণ্ড বিধানের প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রাক্-বৈদিক যুগের অবসান এবং বৈদিক যুগের সূচনার অন্তর্কালীন ইতিহাস আজও আলোচনা-সমালোচনার বিষয়বস্তু। বৈদিক সভ্যতার প্রথম প্রামাণ্য গ্রন্থ ঋক্‌বেদ। তৎকালীন দণ্ডনীতি সম্পর্কীয় নির্দিষ্ট কোনো পুস্তকের সন্ধান না মিললেও বৈদিক স্তোত্রগুলি থেকে জানতে পারা যায় যে বৈদিকযুগের

---

* Indian Journal of Psychology (vol. 40, part 3, 1965, pp 121-125)। লেখকের মূল ইংরাজী রচনা "Crime & Punishment in the Socio-administrative Structure of Ancient India" দ্রষ্টব্য।

নৃপতিরা অপরাধ এবং অপরাধীর বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন, শুধু তাই নয়, অপরাধ প্রতিরোধ বিষয়েও সচেতন ও তৎপর ছিলেন। গুপ্তচরদের সাহায্যে সংবাদ সংগ্রহের পদ্ধতিও বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ভারতে রাজতন্ত্র ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত। সে-যুগের রাজতন্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল প্রজাকল্যাণ। নিজের রাজত্বকে ক্ষমতাশালী করবার এবং রাজত্বে শান্তি-শৃঙ্খলা অব্যাহত রাখবার প্রয়াসে সেই যুগের নৃপতিরা রাজসভার সদস্যদের সহায়তা ও পরামর্শে নানা প্রকার নীতি ও বিধান প্রণয়ন করতেন। রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার মুহূর্ত থেকে রাজ্যের অধীশ্বর ন্যায়দণ্ডের অধিকারী হতেন। ন্যায়দণ্ড অর্থে পরম-পুরুষ-সৃষ্ট একটি বিশিষ্ট রক্ষাকারী ক্ষমতা বোঝায়। এই ক্ষমতা প্রজাবর্গ ও প্রজাপালককে ধর্মপথে সংযুক্ত থাকবার দিব্যদৃষ্টি দান করতো। ফলে রাজা ধর্মপথে থেকে রাজত্ব পরিচালনা করতেন এবং প্রজাপুঞ্জকে অন্যায় ও অবিচারের হাত থেকে রক্ষা করে রাজতন্ত্রের ক্রমবিকাশ অব্যাহত রেখে ক্রমশ শাসনযন্ত্র ও শাসনতন্ত্রকে উন্নত করেছিলেন। যার ফলে রাজ্যের শৃঙ্খলা এবং সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার ভার পুরোহিত ও অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কবলমুক্ত হয়ে একদল বিশেষজ্ঞ রাজনীতিবিদের আয়ত্তে এলো। এঁরা সূচনা করলেন নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর। এই সময় থেকেই সকল পর্যায়ের অপরাধকেই রাজতন্ত্রের বিরোধী হিসাবে ঘোষণা করা হলো। বিভিন্ন পদ্ধতির দণ্ডের প্রবর্তন করা হলো অপরাধের গুরুত্বভেদে। ক্রমশ সুসংবদ্ধ ও সুলিখিত দণ্ডনীতি প্রবর্তিত হয়েছিল।

দণ্ডনীতি ঃ

ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী পরমপুরুষের অংশভূত দণ্ড বিভিন্ন রূপ (নীতি, সরস্বতী, দণ্ডনীতি প্রভৃতি) পরিগ্রহ করে সৃষ্টিকে ধারণ করছে। অসংযত, অবিবেচক এবং শৃঙ্খলাভঙ্গকারীদের দমন করবার উদ্দেশ্যেই দণ্ডের সৃষ্টি। মনুর মতানুযায়ী জাগ্রত এবং নিদ্রিত উভয় অবস্থাতেই প্রাণীকে রক্ষা করবার এবং শাসন করবার দায়িত্ব দণ্ডের। শুক্রাচার্যের

মতে—অসংযত মানুষকে সংযত করা দণ্ডদানের মূল উদ্দেশ্য। কৌটিল্যের মতে—সম্পদ অর্জনে, সংরক্ষণে, বর্ধনে এবং যথাযথ ব্যবহারে দণ্ড মানুষকে সাহায্য করে। প্রাচীন ভারতের মনীষিগণের দৃষ্টিভঙ্গীগুলি বিচার করলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে সমাজের নিরাপত্তা রক্ষাই ছিল দণ্ডের মূল উদ্দেশ্য।

প্রতিশোধ, প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত এবং সংশোধন এই চারিটি প্রধান সূত্রের উপর নির্ভর করে প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতি রূপায়িত হয়েছিল। সেই যুগে প্রতিশোধমূলক শাস্তির প্রচলন থাকলেও কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া ঐ শাস্তি প্রয়োগের নির্দেশ ছিল না। সাধারণভাবে অপরাধমূলক প্রবৃত্তিগুলির নিবৃত্তিই ছিল শাস্তিদানের মূল উদ্দেশ্য। এই জন্যে বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে প্রতিরোধমূলক শাস্তি প্রয়োগ করা হতো। প্রকাশ্য স্থানে কারাগার নির্মাণ এবং বিচারের ফলাফল জনসাধারণকে জ্ঞাত করাবার সুস্পষ্ট নির্দেশ মনু দিয়েছিলেন। ধর্মসূত্রেও আমরা এই নির্দেশের সমর্থন পাই। মনুর নির্দেশ অনুযায়ী কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ জনসাধারণকে জ্ঞাত করাবার উদ্দেশ্যে অপরাধীকে প্রকাশ্য দিবালোকে রাজপথের উপর দিয়ে আনা উচিত এবং জনসাধারণের সম্মুখে প্রকাশ্যভাবেই বিচার ও দণ্ডের নির্দেশ ঘোষণা করা বিধিসঙ্গত ছিল। মৃচ্ছকটিক নাটকে বসন্তসেনাকে হত্যাপরাধে-অভিযুক্ত চারুদত্তকে এইভাবে দণ্ডদানের কাহিনী সেই যুগের বিচার-পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত। গুরু অপরাধে দণ্ডিত অপরাধীর দৈহিক নির্যাতন প্রকাশ্যে করাবার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণকে অপরাধের পরিণতি সম্বন্ধে সচেতন করা। স্বভাব-অপরাধীদের সমাজের দুষ্ট-ক্ষত বিবেচনায় মনু বিভিন্ন পদ্ধতির প্রাণদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং অঙ্গচ্ছেদনের (প্রতিশোধমূলক শাস্তি) নির্দেশ দিয়েছিলেন। শুক্র-নীতিতেও এই মতবাদ সমর্থিত হয়েছে।

অপরাধীর চরিত্র পথ এবং স্বভাব সংশোধন করবার জন্য প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতিতে প্রায়শ্চিত্তের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। গৌতমের ধর্মসূত্রে উল্লেখ আছে যে গুরুর উপদেশ

এবং প্রায়শ্চিত্ত এই দুইয়ের উদ্দেশ্য চিত্তের অনুশাসন। যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতিতে বলা হয়েছে যে ব্যক্তি, পরিবার ও জাতিবিশেষে অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে নৃপতি এমন দণ্ডের বিধান করবেন যাতে ঐ ব্যক্তি দণ্ডাদেশ পালনের পর আবার যেন স্বাভাবিক জীবনযাপন ও ধর্মপালন করতে সমর্থ হয়। শুক্র-নীতি অনুযায়ী—দণ্ডের মাধ্যমে অপরাধী এবং অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের সৎ জীবনযাপন-পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়াই দণ্ডদাতার কর্তব্য। সেই যুগের মনীষীদের মতে, দণ্ডভোগের মাধ্যমে অপরাধী অপরাধোত্তর অনুশোচনা থেকে মুক্তি পায়। মনুর মতে, যথোপযুক্ত দণ্ডভোগের পর অপরাধজনিত সমস্ত পাপ দূর হয় এবং পরবর্তী কর্মধারার সুকৃতির ফলে ঐ ব্যক্তি স্বর্গারোহণেরও যোগ্য হতে পারে। রাজদণ্ড কোনো অপরাধীকে অব্যাহতি দিলে দণ্ডভোগ না করেই তার পক্ষে অপরাধজনিত পাপ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব—মনু-স্মৃতি এবং যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতিতে এই মতবাদ সমর্থিত হয়েছে।

প্রাচীন ভারতে দণ্ড বিধান বা প্রয়োগ সম্পর্কীয় অনধিকার চর্চা অপরাধ বলে গণ্য হতো। অপরাধী সম্পর্কীয় যাবতীয় মীমাংসার একমাত্র অধিকারী ছিলেন রাজা এবং তাঁর রাজদণ্ড। রাজাকে দণ্ডের অধিপতি বলা হতো। দণ্ডের পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাস করা এবং প্রয়োজনবোধে অপরাধীকে ক্ষমা করবার অধিকার রাজা ছাড়া আর কারো ছিল না। বিচারকের কর্তব্য ছিল শুধুমাত্র দণ্ড বিধান করা। শুক্র-নীতিতে কেবলমাত্র ধিক্‌দণ্ড এবং বাক্‌দণ্ডের সম্পূর্ণ অধিকার বিচারকের উপর ন্যস্ত করবার নির্দেশ দেওয়া আছে। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান বা উৎসব উপলক্ষে রাজা দণ্ডাধীন অপরাধীদের মুক্তি দেবার অধিকারী ছিলেন। খৃষ্টপূর্ব ৬১৮ অব্দে লেখা ভদ্রবাহুর কল্পসূত্রে এবং পরবর্তী যুগের বৃহৎ-সংহিতায় এই নির্দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্রাট অশোকের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে তিনি তাঁর ছাব্বিশ বৎসরব্যাপী রাজত্বকালে পঁচিশবার অপরাধীদের মুক্তি দিয়েছিলেন। সম্রাট অশোকের অভিষেক দিবসটি তাঁর রাজত্বে প্রতিবৎসর আড়ম্বরের সঙ্গে প্রতিপালিত হতো। বাণভট্টের হর্ষচরিতে সম্রাট হর্ষবর্ধন সম্পর্কে

অনুরূপ কাহিনী লিখিত আছে। মহাকবি কালিদাস রচিত রঘুবংশ ও মালবিকাগ্নিমিত্রে অনুরূপ কাহিনীর উল্লেখ আছে। মৃচ্ছকটিকে চারুদত্তের উপর প্রদত্ত দণ্ডাজ্ঞা পালনের পূর্বে জনৈক ঘাতকের বিবৃতি ঐ রীতির প্রচলন সমর্থন করে।

মনু এবং বিষ্ণুর মতে অনুশোচনা-বিমুখ স্বভাব-অপরাধীদের কোনো উপলক্ষেই মুক্তি দেবার অধিকার রাজার ছিল না। প্রাচীন ভারতের শাসন ব্যবস্থায় এই নির্দেশ শ্রদ্ধার সঙ্গেই পালিত হতো। এই দুইজন স্মার্তের মতে ওই শ্রেণীর অপরাধীকে ক্ষমা করলে অপরাধজনিত পাপ রাজার উপর বর্তাবে। মনুর মতে—লুণ্ঠন, পাশবিক অত্যাচার, অগ্নিসংযোগ, নরহত্যা, প্রভৃতি বল প্রয়োগজনিত অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত অপরাধী ক্ষমার অযোগ্য। এদের অপরাধ ক্ষমা করলে রাজা নিজেই অপরাধী হবেন। বিষ্ণুর মতে—স্বভাব-অপরাধীও ক্ষমার অযোগ্য। অপরাধীর ক্ষমা প্রসঙ্গে এই বিধানটি সেই যুগে প্রচলিত থাকবার প্রমাণ কালিদাস, শূদ্রক প্রমুখ লেখকদের লেখা বিভিন্ন নাটকে এবং অশোকের শিলালিপিতে পাওয়া যায়।

প্রাচীন ভারতের বিশেষজ্ঞগণ কয়েকটি নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে দণ্ডের মান নিরূপণ করতেন। গৌতমের মতে—দণ্ডাদেশের পূর্বে রাজা অপরাধীর কুলমর্যাদা, সামর্থ্য, উদ্দেশ্য এবং অপরাধের গুরুত্ব বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে জ্ঞাত হবেন এবং এই সব তথ্যের ভিত্তিতে বিচার করে দণ্ডাদেশ দেবেন। বশিষ্ঠ-স্মৃতিতেও অনুরূপ নীতির সমর্থন পাওয়া যায়। কৌটিল্যের মতে—অপরাধীর ব্যক্তিত্ব, ঘটনাচক্র এবং ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সর্বপ্রকার পরিস্থিতির উপর বিচারপদ্ধতি এবং দণ্ডাদেশ নির্ভরশীল। কৌটিল্যের মতে—একই অপরাধের জন্যে জাতিধর্ম নির্বিশেষে একই শাস্তি প্রযুক্ত হওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। মনু-স্মৃতির বিখ্যাত টীকাকার মেধাতিথির মতে—দণ্ডদানকালে রাজাকে অনুবন্ধ বিষয়ে সচেতন থাকবার নির্দেশ দিয়েছেন মনু। অনুবন্ধের অর্থ বিশ্লেষণ করলে সহজেই বুঝা যায় যে আদিম প্রবৃত্তির স্থূল ও অসামাজিক চরিতার্থতা, পানোন্মত্ততা, প্ররোচনা, ঘটনার বিকৃতি এবং অপরাধীর মানসিক বিন্যাস

সম্পর্কে সেই যুগের নীতি-প্রণেতাগণ বিজ্ঞাত ছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতির টীকাকার বিজ্ঞানেশ্বরের (মিতাক্ষরা প্রণেতা) মতে—কেবলমাত্র উপযুক্ত বিষয়গুলির উপর দণ্ডবিধাতার সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করা সমীচীন নয়। ঐগুলি বিচার পদ্ধতির বিশেষ সহায়ক হলেও দণ্ডবিধাতার দিব্যদৃষ্টিই দণ্ডের যথার্থ মান নিধারক। রাজা যেমন রাজদণ্ডের অধিপতি, অনুরূপভাবে তাঁর দিব্যদৃষ্টি তাঁর বুদ্ধির অধিপতি। সুতরাং দিব্যদৃষ্টির সহায়তা ব্যতীত নির্ভুল দণ্ডাদেশ সম্ভব নয়। বর্ধমান প্রণীত 'দণ্ডবিবেক' গ্রন্থে তথ্য সংগ্রহের জন্যে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির সুস্পষ্ট-নির্দেশ পাওয়া যায়। বর্ধমানের মতে, তথ্য সংগ্রহের জন্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি একান্তভাবে প্রয়োজনীয় :

(১) জাতি—অপরাধীর কুল পরিচয়।

(২) দ্রব্য—অপরাধের বস্তু।

(৩) পরিমাণ—ক্ষতির, আঘাতের ও হানির পরিমাণ।

(৪) বিনিয়োগ—ক্ষতি, আঘাত ও হানির পরিমাণের আনুমানিক বা যথার্থ মূল্য নির্ধারণ।

(৫) পরিগ্রহ—অপরাধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত কে হয়েছে ?

(৬) বয়:ক্রম—অপরাধীর বয়স।

(৭) শক্তি—অপরাধীর সামর্থ্য (শারীরিক, মানসিক অর্থাৎ শিক্ষিত-অশিক্ষিত এবং আর্থিক)।

(৮) গুণ—অপরাধীর কর্ম বা পেশা।

(৯) দোষ—অপরাধ কোন্ শ্রেণীর এবং স্বভাব-অপরাধী কি না।

প্রাচীন ভারতের প্রামাণ্য গ্রন্থগুলি থেকে যে সমস্ত বিবরণ পাওয়া যায় সেগুলির কোনো স্থানেই অপরাধমূলক আচরণের উপর নির্জ্ঞান মনের প্রভাব সম্পর্কে কোনো আলোচনার উল্লেখ পাওয়া যায় না। অনুমান করা যেতে পারে যে সেই যুগের মনোবিজ্ঞানীরা অপরাধ সম্পর্কীয় নীতি প্রণয়নে কোনো সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নি। প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতির মধ্যে উন্নত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া সত্ত্বেও সেই যুগের উন্নত মনোবিদ্যার বিশেষ কোনো অবদান স্বীকৃতি পায় না।

কয়েকটি ক্ষেত্রে যে আভাস পাওয়া যায় তা সম্পূর্ণভাবে নীতি প্রণেতার দিব্যদৃষ্টির প্রকাশ মাত্র।

অপরাধ অনুসন্ধান ও প্রতিরোধ ঃ

অপরাধ সম্বন্ধে অনুসন্ধান এবং অপরাধ প্রতিরোধ করবার উদ্দেশ্যে প্রাচীন ভারতের নীতি-প্রণেতাগণ নির্দিষ্ট সংস্থার মাধ্যমে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের দেশব্যাপী বিন্যাসের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই সংস্থা এবং এর অধীন কর্মীদের মাধ্যমে রাজার শাসনাধীন অঞ্চলগুলির আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা পেতো বলে এই কর্মীদের রক্ষী, এবং ভারপ্রাপ্ত পদস্থ কর্মীদের বলা হতো আরক্ষক। বিভিন্ন গ্রন্থে চৌরোদ্ধারণিক, দণ্ডিক, দণ্ডপাশিক, প্রমুখ কর্মচারীদের যে উল্লেখ পাওয়া যায় তারা সবাই ঐ রক্ষী-সংস্থাভুক্ত কর্মচারী। মনু-স্মৃতিতে গ্রামীণ রক্ষী-সংস্থার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সংস্থার কর্মিগণ গুল্ম নামে অভিহিত হতেন। যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতিতে আরক্ষকগণকে গ্রাহক নামে বিশেষিত করা হয়েছে। এই সূত্রে স্থানপাল ও স্থানিক সংজ্ঞা বহু স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। স্থানপাল বা স্থানিক প্রতিটি আঞ্চলিক রক্ষীকেন্দ্রের বা 'স্থানের' (বর্তমানে থানার) দপ্তর পরিচালনা করতেন।

অপরাধ প্রতিরোধকল্পে নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তি বিশেষের উপর আরক্ষকগণ সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। প্রয়োজন বোধে এই সমস্ত বিভিন্ন প্রকৃতির ব্যক্তিদের অবরুদ্ধ করা হতো।

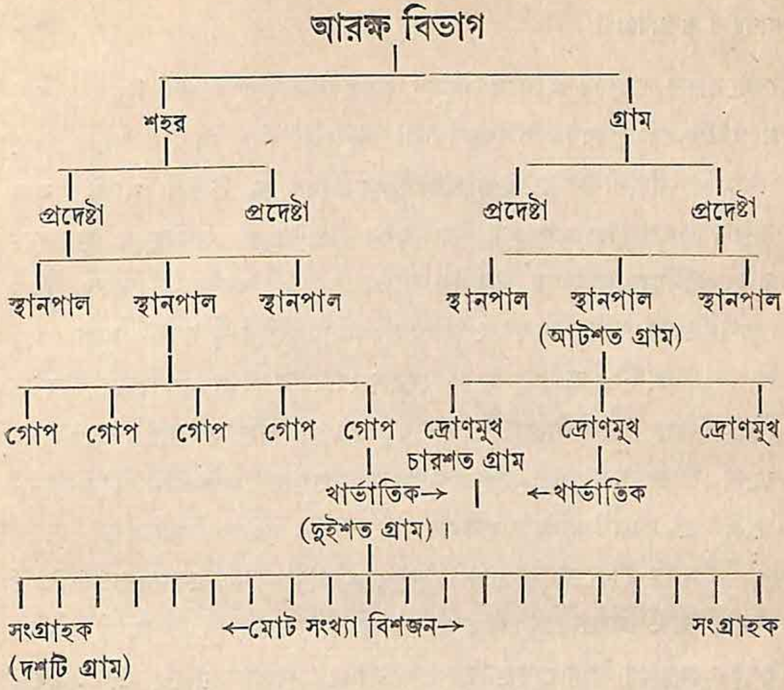
১। বৃত্তি বা উপজীবিকাহীন ব্যক্তি,
২। অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি,
৩। পতনোন্মুখ ধনী,
৪। বিপথগামী পুরুষ অথবা রমণী,
৫। সন্দেহজনক গতিবিধিযুক্ত পুরুষ অথবা রমণী,
৬। নিশাচর, মদ্যপ, লালসাযুক্ত পুরুষ,
৭। কাল্পনিক ভয়ে ভীত ব্যক্তি,
৮। গোপনে পণ্যদ্রব্যের ক্রেতা এবং বিক্রেতা,

৯। স্বর্ণ বা অনুরূপ মূল্যবান দ্রব্যের গুপ্ত ব্যবসায়ী, এবং

১০। স্বভাব অপরাধী।

ব্যবসা এবং গৃহস্থ ব্যক্তির সম্পত্তি সংক্রান্ত অপরাধ প্রতিরোধকল্পে রাজকর্মচারীর অনুমতি ব্যতীত এবং অপ্রকাশ্যে যে কোনো মূল্যবান বস্তু ক্রয় বা বিক্রয় অপরাধ হিসাবে গণ্য হতো। রাত্রিকালে নগরে শান্তি ও শৃঙ্খলা অব্যাহত রাখবার জন্যে কৌটিল্য সান্ধ্য আইনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রতিরাত্রে আঞ্চলিক রাজকর্মচারীর দপ্তর থেকে বিশেষ ভেরী-সংকেত ঘোষিত হবার পর বিনা অনুমতিতে রাজপথে বিচরণ দণ্ডনীয় ছিল। প্রতি রাত্রে প্রত্যেক গৃহস্বামীর গৃহে অবস্থিতি অবশ্য কর্তব্য ছিল। অনুপস্থিতির কারণ ভারপ্রাপ্ত আঞ্চলিক আরক্ষকের কাছে সন্তোষজনক না হলে অথবা অনুমোদিত না হলে গৃহস্বামী দণ্ডনীয় হতেন। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে—আরক্ষক ও রক্ষীদের সংবাদ-সংগ্রহ নির্ভুল হলে তাঁরা পুরস্কৃত হবেন নচেৎ তাঁদের বিরুদ্ধেও যথোপযুক্ত দণ্ডাদেশ দান করা হবে। কর্তব্য পালনে অক্ষমতা দণ্ডনীয় হওয়ায় সেই যুগে রাজ কর্মচারিগণ স্বভাবতঃ কর্তব্যনিষ্ঠ হতেন।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের আরক্ষ বিভাগের বিবরণ পাওয়া যায়। ঐ বিবরণ অনুযায়ী রাজধানী এবং শহরের শান্তি ও শৃঙ্খলার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল 'প্রদেষ্টা'-র উপর। প্রদেষ্টার অধীনে বহু সংখ্যক 'গোপ' নিযুক্ত থাকতেন। এই গোপ বা নগররক্ষিগণ রাজধানী এবং শহরের বিভিন্ন অঞ্চলের 'স্থানে' স্থানিক বা স্থানপালদের নির্দেশে আঞ্চলিক শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করতেন। গ্রামাঞ্চলে প্রতি দশটি গ্রামের জন্যে একটি রক্ষীকেন্দ্রের ব্যবস্থা ছিল। এই কেন্দ্রগুলিকে সংগ্রাহণ বলা হতো। বিশটি সংগ্রাহণের পর্যবেক্ষণের ভার একজন খার্ভাতিকের উপর ন্যস্ত ছিল। দুটি খার্ভাতিকের দপ্তর একজন দ্রোণমুখের তত্ত্বাবধানে থাকতো। গ্রামাঞ্চলের প্রতি স্থানপালকে দু-জন দ্রোণমুখের দপ্তর পরিচালনা করতে হতো। সুতরাং বেশ বুঝা যায় যে একজন স্থান-পালের উপর আটশত গ্রামের শান্তি ও শৃঙ্খলার ভার ন্যস্ত ছিল।



কর্মদপ্তরের অন্তভু্ক্ত অঞ্চলগুলির ব্যাপ্তি অনুযায়ী আরক্ষকগণের অধীনে নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষিত গুপ্তচর নিযুক্ত থাকতেন। এঁদের প্রধান কাজ ছিল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সংবাদ গোপনে সংগ্রহ করা। অপরাধ অনুসন্ধান এবং অপরাধ প্রতিরোধ সম্পর্কীয় বহু প্রয়োজনীয় তথ্য গুপ্তচরদের সাহায্যে সংগৃহীত হতো। আরক্ষকেরা গুপ্তচরের সাহায্যে অপরাধীর অবস্থান, অপরাধমূলক কাজের পরিচারকদের সন্ধান, অপরাধপ্রবণ লোকেদের গতিবিধি ইত্যাদি প্রতিটি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সংগ্রহ করতেন। কাত্যায়ন-সূত্র থেকে জানতে পারা যায় যে, রাজার নিজস্ব গুপ্তচরদের 'সূচক' নামে অভিহিত করা হতো। কাত্যায়ন-সূত্রে এক শ্রেণীর উচ্চশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবকের উল্লেখ পাওয়া যায়—এই স্বেচ্ছাসেবকরা বিনা পারিশ্রমিকে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার সহায়ক সংবাদগুলি গোপনে রাজা অথবা রাজকর্মচারীকে সরবরাহ করতো। এই শ্রেণীর স্বেচ্ছাসেবকদের নাম ছিল 'স্তোভক'। কৌটিল্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের সংবাদ গোপনে সংগ্রহের জন্যে বিভিন্ন প্রকৃতির ও বিভিন্ন উপজীবিকা-বিশিষ্ট

লোকেদের গুপ্তচর হিসাবে নিযুক্ত করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই যুগে এক দিকে যেমন পণ্ডিত, চিকিৎসক, পুরোহিত, সন্ন্যাসী, গৃহী, ভিক্ষু, শিক্ষিতা বর্ষীয়সী বিধবা, ইত্যাদির গুপ্তচর হিসাবে উল্লেখ পাওয়া যায় অনুরূপভাবে কুব্জ, খঞ্জ, মূক এবং যবন শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের গুপ্তচর-বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকবার প্রমাণও পাওয়া যায়। কয়েকটি ক্ষেত্রে উচ্চ শ্রেণীর রূপোপজীবিনীদের গুপ্ত সংবাদ সরবরাহের কাজে নিযুক্ত করা হতো। প্রাচীন ভারতে গুপ্তচরদের সংবাদ সরবরাহের স্বতন্ত্র পদ্ধতি ছিল। প্রয়োজনবোধে শিক্ষিত কবুতরের সাহায্যেও বার্তা প্রেরণ করা হতো। গবেষকগণের মতে কৌটিল্যের গুপ্তচর সম্পর্কীয় রীতিনীতি-গুলি সম্রাট আকবরের রাজত্বকালেও সমাদরে গৃহীত হয়েছিল।

প্রাচীন ভারতের অপরাধ অনুসন্ধান প্রণালী প্রশংসনীয়ভাবে উন্নত না হলেও ঐ সময়ের সুযোগ ও সুবিধা অনুযায়ী যুগোপযোগী ছিল। সেই যুগের প্রামাণ্য গ্রন্থগুলি থেকে জানতে পারা যায় যে, ঐ সময়ের বিশেষজ্ঞগণ হত্যাপরাধের জন্যে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ও সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতিকে ঘটনার কেন্দ্র বলে মনে করতেন। এই ক্ষেত্রগুলির মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ (১) নারীঘটিত বিসংবাদ, (২) সম্পত্তি-জনিত মতভেদ, (৩) প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মনোমালিন্য, (৪) শত্রুতা-মূলক মনোভাব, (৫) প্রতারণা, প্ররোচনা ইত্যাদি বিষয়ক। উক্ত বিষয়গুলির নিষ্পত্তি মনোমত না হওয়ায় ক্রোধের উৎপত্তি এবং ঐ ক্রোধের নিবৃত্তির পরিণতি হত্যা অথবা সমপর্যায়ের কোনো অপরাধের মূল কারণ বলে তাঁরা সিদ্ধান্ত করতেন। রহস্যজনকভাবে কারো মৃত্যু ঘটলে সেই যুগে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে তথ্য সংগ্রহ ও অনুসন্ধান কার্য পরিচালিত হতো ঃ

(১) মৃত্যু সাধারণভাবে ঘটেছে কি না ?

(২) উহা আত্মহত্যা কি না ?

(৩) উহা হত্যা কি না ?

(৪) হত্যাকারী দস্যু-তস্করাদি, না অন্য কোনো প্রকারের শত্রু ?

(৫) স্থানীয় অনুসন্ধান :

(ক) নিহত ব্যক্তির সঙ্গে কার শেষ সাক্ষাৎ হয়েছিল ?

(খ) নিহত ব্যক্তি হত্যার পূর্বে কোথায় ছিল ?

(গ) হত্যার জন্যে কাকে সন্দেহ করা যায় ?

অর্থশাস্ত্রে শব-ব্যবচ্ছেদ দ্বারা প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের নির্দেশ পাওয়া যায়। মনু-স্মৃতি এবং যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতির টীকাকারগণ তাঁদের ভাষ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অপরাধ অনুসন্ধানের নির্দেশ দিয়েছেন। এই নির্দেশে হত্যা-অপরাধ অনুসন্ধানের জন্যে নারীঘটিত, বৃত্তি ও সম্পত্তি-জনিত ক্ষেত্রগুলির উপর বিশেষভাবে অনুসন্ধানের উল্লেখ আছে।

কৌটিল্যের মতে—অভিযুক্ত ব্যক্তির গতিবিধি, অস্ত্রশস্ত্র, বন্ধুবান্ধব, প্ররোচক, আয়ত্তাধীন সম্পত্তি, বৃত্তি প্রভৃতি সম্পর্কে সঠিক বিবরণ সংগ্রহ করবার জন্যে সংগ্রহকারীর ছল, বল এবং কৌশলের সাহায্য গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত পদচিহ্নের সঙ্গে অভিযুক্ত ব্যক্তির পদচিহ্নের সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার নির্দেশ অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায়। কৌটিল্যের মতে ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত কোনো সুগন্ধী বস্ত্রখণ্ড অনুসন্ধানের কার্যে বিশেষ সহায়ক। বিভিন্ন যৌন অপরাধের অনুসন্ধান সম্পর্কেও সেই যুগের নীতিগ্রন্থগুলিতে সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়। নাবালিকা অথবা সাবালিকা, বিবাহিতা, এমন কি পতিতাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যৌনসংগম সেই যুগে অপরাধ হিসাবে গণ্য হতো।

ছদ্মবেশে বসবাসকারী ব্যক্তি, সন্দেহজনক গতিবিধিযুক্ত ব্যক্তি এবং অতিরিক্ত মদ্যপায়ী; অপব্যয়, বিলাসিতা ও দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত ব্যক্তির আর্থিক সঙ্গতি সন্দেহজনক হলে ঐ ব্যক্তিকে অবরুদ্ধ করবার নির্দেশ অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায়। উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্যে কৌটিল্য বিশেষ শ্রেণীর উচ্চশিক্ষিত গুপ্তচর নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

অপরাধ বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ বিষয়ে আলোচনায় প্রাচীন ভারতের অপরাধ-বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ মূল্যবান তথ্যের সন্ধান সম্পর্কে ইঙ্গিত

দেয়। সেই যুগের স্মার্ত পণ্ডিতগণের প্রণীত নীতিগুলি বর্তমানের চিন্তাধারায় বিশ্লেষণের বিষয়বস্তু। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে সেই যুগের নীতিগুলির প্রয়োগ-মূল্যের মান নির্ধারণ করবার জন্যে বিশদভাবে আলোচনা প্রয়োজন। সেই সময়ের মনীষিগণের প্রণীত অমূল্য গ্রন্থগুলির উপর আজকালকার গবেষকদের মনোযোগ আকর্ষণ করাই এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

অপরাধ-সমীক্ষা*

অপরাধ-বিজ্ঞান প্রসঙ্গে কোনো আলোচনা করতে গেলেই দুটো প্রশ্ন প্রধানতঃ মনে আসে—অপরাধ-বৃত্তি স্বভাবজ কি না এবং অপরাধীর মনের কার্যকলাপ বা দুষ্ক্রিয় ব্যক্তিত্বের জন্যে পরিবেশের প্রভাব কতখানি দায়ী। অপরাধ-বিজ্ঞান বর্তমানে প্রস্তুতির পথে ; কারণ অপরাধ এবং অপরাধী এই দুইয়ের নিরপেক্ষ সংজ্ঞা এবং বিচার-পদ্ধতি এখনও সম্ভব হয়ে ওঠে নি। অপরাধ-বিজ্ঞানীরা সভ্যজগতের বিভিন্ন সমাজের এবং অনুন্নত ও অর্ধোন্নত বিভিন্ন জাতির মধ্যে অপরাধ এবং অপরাধ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ এবং ওই বিষয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন। এই অনুসন্ধানের জটিলতা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে বলতে গেলে এইটুকুই বলা যথেষ্ট যে অপরাধ-বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানের লক্ষ্যবস্তু এই বিরাট মনুষ্যসমাজের একটি মুষ্টিমেয় নেতি মনোভাবমূলক গোষ্ঠী, আইনের দৃষ্টিতে যারা অপরাধী হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। অনেক সময় অনেক অপরাধী নিজেদের চাতুর্যের বলে সমাজের চোখে ধুলো দিতে সমর্থ হওয়ার জন্য অপরাধী বলে পরিগণিত হয় না। স্পর্শ, দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদির মতো অপরাধবোধমূলক কোনো ইন্দ্রিয় আমাদের নেই অথবা এইরূপ কোনো নির্ণেয়ক যন্ত্রেরও আবিষ্কার হয়নি। সুতরাং অপরাধ যুক্তি, বিবেচনা এবং প্রমাণের উপর নির্ভরশীল। স্থান, কাল, পাত্রভেদে এর পরিবর্তন হয়ে থাকে। দৈনন্দিন কার্যের প্রয়োজনীয়তা এবং পরিবর্তন অনুযায়ী অপরাধ সৃষ্টি হয় অথবা লোপ পেয়ে থাকে।

অধিকাংশের মতের বিরুদ্ধে কোনো কিছু ঘটলে তাকে অথবা সেই কাজকেই আমরা সাধারণতঃ অপরাধের পর্যায়ে ফেলে থাকি। সামাজিক স্বার্থ আকস্মিকভাবে আক্রান্ত হলে সমাজ সেই কাজকে অপরাধ বলে।

---

* মাতৃভাষায় বৈজ্ঞানিক রচনা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে, স্বর্গীয় বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর উৎসাহে রচিত এবং "জ্ঞান-বিজ্ঞান" পত্রিকায় প্রথম পুরস্কার-প্রাপ্ত রচনা হিসাবে প্রকাশিত।

এই জন্যেই সামাজিক রুচির বিরোধিতা অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। সমাজের আইন এবং শৃঙ্খলা ব্যতিক্রমকারী প্রত্যেক কাজকেই সাধারণতঃ অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে। সুতরাং অপরাধ এবং অপরাধীর সংজ্ঞা সমাজ-সৃষ্ট এবং বৃহদাংশের মতামতের উপর নির্ভরশীল।

সামাজিক গঠনতন্ত্র এমনভাবে গঠিত যাতে জীবনের প্রয়োজনীয় কোনো বস্তু সমাজ-অনুমোদিত উপায়ে সংগ্রহ করায় অপরাধ সংঘটিত হয় না। মানুষের প্রাথমিক প্রবৃত্তিগুলির চরিতার্থতার ব্যবস্থা এবং আবেগজনিত ইচ্ছা প্রশমনের উপযুক্ত উপায় সমাজ-ব্যবস্থায় থাকে বলে সমাজ সংগঠকগণ দাবি করে থাকেন। এই আনুমানিক সত্যের উপর নির্ভর করে সমাজের নিয়মকানুন এবং বিভিন্ন শিষ্টাচারবিধিসমূহ গঠিত হতে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় যে বহুক্ষেত্রে ঐ আদর্শে আনুমানিক সত্যের অসম্পূর্ণতা বর্তমান। এই জন্যেই মতবিরোধের সৃষ্টি হয় এবং নানারূপ অসুবিধা দূর করবার জন্যে ব্যক্তিবিশেষকে স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী ঈপ্সিত বস্তু সংগ্রহ করতে হয়। এই থেকেই শুরু হয় অপরাধমূলক কার্যকলাপ। সাধারণতঃ আমরা অনুমান করে থাকি যে মানুষের প্রকৃতিতে যেটুকু বাধা দেবার ক্ষমতা থাকে তার জোরে মানুষ আপনার প্রবৃত্তিগুলিকে বিভিন্নক্ষেত্রে দমন করতে সক্ষম হয়। মানুষের মনের এই বাধা দেবার বিশেষ শক্তির বলেই সে পরিবেশের বিভিন্ন উত্তেজনায় অবিচলিত থাকে। যারা অবিচলিত থাকতে না পেরে আইন অমান্য করে আদিম ইচ্ছাগুলিকে চরিতার্থ করতে চায়, তাদের অপরাধীর পর্যায়ে ফেলা হয়ে থাকে। সে জন্যে সামাজিক পরিবেশে এবং সমাজের চোখে দুষ্ট আচরণগুলিকে অপরাধমূলক বলা হয়ে থাকে। সভ্য সমাজে অধিকাংশ অপরাধই পরিবেশ-সৃষ্ট। আর্থিক সঙ্কট এবং চূড়ান্ত লোভ ও তজ্জনিত বিকৃত ইচ্ছা মানুষকে অনেক ক্ষেত্রে তার শিক্ষা, দীক্ষা এবং সংস্কৃতিকে ভুলতে বাধ্য করে। এ-সব অবস্থার বিপাকে পড়ে মানুষ স্বীয় কল্পনাতীত কাজ করে এবং পরিণামে অপরাধী হয়ে পড়ে। জীবন যখন স্বচ্ছন্দ গতিতে চলে; আহার, বাসস্থানের যখন অকুলান হয় না, আর্থিক অনটন যখন জীবনের গতিকে রুদ্ধ করে

না, তখন যাদের কাছে অন্যায় কাজ বা অপরাধ কল্পনাতীত ঠিক তারাই প্রতিকূল পরিবেশে, ঘটনার দুর্বিপাকে, অভাবে-অনটনে বিভিন্ন তাড়নায় বিপর্যস্ত হয়ে অপরাধ করে ফেলতে পারে। সুতরাং বিশেষ কারণে বা বিশেষ ভাবে পিষ্ট হবার পর স্বীয় সত্তা বজায় রাখবার জন্যে মানুষ অপরাধমূলক আচরণে লিপ্ত হয়ে পড়তে পারে।

প্রকৃতি প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে যে সব প্রবৃত্তি সংযোজন করেছে, সেগুলির প্রত্যেকটিই প্রাণীর স্বীয় সত্তা বজায় রাখবার জন্যে প্রয়োজনীয়। মানুষ প্রাণীজগতের শীর্ষস্থানে থাকলেও তাকে স্বীয় সত্তা বজায় রাখবার জন্যে জীবন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে হয়। প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং বিবর্তনশীল সর্বোন্নত-জীব মানুষের দেহ এবং মন ও উহাদের কার্যকলাপের মধ্যে হঠাৎ কোনো কিছুর আবির্ভাব হয়নি। এর জন্যে বিবর্তনজনিত পরিবর্তনই দায়ী। প্রাণীদের জীবনধারণের জন্যে যে সব অবয়ব অপ্রয়োজনীয়, বিবর্তনের ফলে সেগুলি প্রাণীদেহ থেকে লুপ্ত হয়ে যায় এবং যেগুলি প্রয়োজনীয় সেগুলি থেকে গিয়ে ক্রমশঃ উন্নত হতে থাকে। মানুষের মধ্যে যে আদিম প্রবৃত্তিগুলি আজও বর্তমান রয়েছে, সেগুলির প্রয়োজন আজও শেষ হয়নি এবং কোনোদিন শেষ হবেও না। কারণ ক্ষুধা, বংশবৃদ্ধির ইচ্ছা এবং স্বীয় সত্তার প্রকাশ এই তিনটি প্রধান প্রাথমিক বৃত্তির সমন্বয় জীবন রক্ষার জন্যে অতি প্রয়োজনীয়। আদিম প্রবৃত্তিজনিত প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে উক্ত তিনটির কোনো একটির ছোঁয়াচ থাকবেই। অপরাধীর অপরাধমূলক কাজের মধ্যে আমরা ওই প্রবৃত্তিগুলির প্রকাশ দেখতে পাই। এমন কোনো অপরাধ নাই যা ওই আদিম প্রবৃত্তিগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট নয়। সুতরাং সৃষ্টির শুরু থেকে ঠিক যেভাবে আদিম প্রবৃত্তিগুলি প্রয়োজনীয় হিসাবে বংশপরম্পরায় জীবের মধ্যে বজায় থেকে গেছে এবং আজও মানুষের মধ্যে রয়েছে, ঠিক সেভাবেই ওই প্রবৃত্তিগুলির নিশ্চিত উপস্থিতির সুযোগ নিয়ে অপরাধ করার সম্ভাবনাও বংশ পরম্পরায় বজায় থেকে গেছে। আদিম প্রবৃত্তিগুলি অনুকূল আবহাওয়া ছাড়া যেমন প্রকাশ পাওয়ার সুযোগ

পায় না, অপরাধ করবার বাসনাও তেমনি মানবমনের গহন কোণে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও অনুকূল পরিবেশে এবং উত্তেজনার মুহূর্ত ছাড়া প্রকাশ পায় না। সভ্য এবং উন্নতশ্রেণীর মানবসমাজ থেকে শুরু করে নীচের দিকে, অর্থাৎ প্রথমে অনুন্নত মানবসমাজ, তারপর মানবেতর জীব, তারপর উন্নতশ্রেণীর স্তন্যপায়ী মেরুদণ্ডা, অন্যান্য মেরুদণ্ডী, অমেরুদণ্ডী, তারপর দ্বিকোষী ও এক-কোষী—এভাবে গেলে দেখা যায় যে মনের জটিলতা যেখানে বেশি, অপরাধপ্রবণতা এবং অপরাধীও সেইখানেই বেশি। মনের অস্তিত্ব যেখানে নেই, অপরাধও সেখানে নেই।

পৃথিবীতে যখন প্রথম প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছিল তখন তার দৈহিক আকৃতিতে কোনো জটিলতা ছিল না। মানসিক শক্তির পরিবর্তে তার মধ্যে উপস্থিত ছিল এক অতি সাধারণ প্রকৃতির স্থূল বোধশক্তি, যার সাহায্যে সে পারিপার্শ্বিক উত্তেজনা বা উদ্দীপনায় সাড়া দিতে পারতো। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আবির্ভাব বোধহয় সর্বপ্রথমে ওই প্রাণীদের মধ্যে জীবনযুদ্ধের বীজ বুনে দিয়েছিল। প্রাণীজগতের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক প্রাণীর একমাত্র উদ্দেশ্যই হলো অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্যে যুদ্ধ করা। উন্নত মন বা বিবেচনার ক্ষমতা এই সময়ে প্রাণীদের ছিল না; তাই নিজেদের বাঁচবার জন্যে অবাঞ্ছিতকে অপসারণ করা এই সময় থেকেই প্রাণীরা কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করেছিল। ক্রমবিবর্তনের ফলে পৃথিবীতে নানা চরিত্রের প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছিল। প্রাণী-জগতের প্রসারের সঙ্গে পৃথিবীতে আহার ও বাসস্থানের সমস্যা দেখা দিতে শুরু করলো। এ জন্যে প্রত্যেক প্রাণীই বেঁচে থাকবার উদ্দেশ্যে এবং স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির জন্যে যা কিছু অবাঞ্ছিত তার ধ্বংস করবার চেষ্টা করতে শিক্ষা পেল। এরই ফলে এক শ্রেণীর প্রাণী-সমাজ অপর প্রাণী-সমাজের শত্রু হয়ে পড়লো এবং তাদের মধ্যে খাদ্য-খাদকের সম্বন্ধ গড়ে উঠলো। এভাবে সমশ্রেণীর প্রাণী সমাজে ও ভিন্ন শ্রেণীর প্রাণী-সমাজের মধ্যে স্বায় স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে বঞ্চনা ও অপসারণের নানা কৌশল প্রবর্তিত হয়েছিল। স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে কোনো

কাজকে কেউ অপরাধ বলে ভাবে না ; তাই সমাজগত, শ্রেণীগত এবং দলগত পার্থক্যভেদে অন্যায় বা অপরাধ স্বীকৃত এবং অস্বীকৃত হয়ে থাকে। উন্নত সমাজ-ব্যবস্থায় রাজনৈতিক অপরাধ এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

মানুষের মন বর্তমানে উন্নতির যে স্তরেই এসে উপনীত হোক না কেন, বিবর্তনের বৈশিষ্ট্যে অনুন্নত প্রাণীর জীবনের অনেক বিস্মৃত ছবির ছোঁয়াচ মানব মনে বর্তমান আছে। তাই নির্দিষ্ট অনুকূল আবহাওয়ায় অপরাধস্পৃহা প্রকট হয় বা আদিম প্রবৃত্তিগুলির অমার্জিত প্রকাশ সম্ভব হয়ে থাকে। অপরাধী ছাপ নিয়ে কেউই জন্মগ্রহণ করে না বা অপরাধী মনোভাবও পৃথকভাবে বংশ পরম্পরায় সংক্রামিত হয় না।

বর্তমানে অপরাধ-বিজ্ঞানীরা সমাজ-বিজ্ঞানীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে যে সব গবেষণা করছেন সেগুলির ফল বিচার করলে দেখতে পাওয়া যায় যে মনো-জগতের বিশৃঙ্খলাই মানুষের মধ্যে লুক্কায়িত আদিম প্রবৃত্তি-গুলির অসংযত প্রকাশকে সম্ভাব্য করে তোলে। অবশ্য এই জন্য কতকগুলি বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থা দায়ী। মানসিক পরিপূর্তির সময় উপযুক্ত তত্ত্বাবধান না হলে মানব-মনের কতকগুলি অপূর্ণ ইচ্ছার বিকৃতি ঘটে থাকে। এই বিকৃত ইচ্ছা এবং অপূর্ণ বাসনা এমন ভাবে মনের জটিলতাকে বিরুদ্ধবাদী করে তোলে যে মানুষ স্বীয় শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করে সাময়িকভাবে আদিম প্রবৃত্তির দাস হয়ে যায় এবং তাদের সেই সময়ের কার্যকলাপ আইনের বিচারে অনেক ক্ষেত্রে তাদের অপরাধী করে তোলে। এ সব দুর্ভাগাদের নিজেদের মনের উপর কোনো দখল নেই ; তারা জানে না কেন তারা অন্যায় করে। এদের শান্ত অবস্থায় জিজ্ঞাসা করলে উত্তর পাওয়া যায়—কেন করছি জানি না, অথবা যা করেছি বাধ্য হয়ে করেছি, কিংবা আমি যা করেছি ঠিকই করেছি, সমাজের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে করেছি, ইত্যাদি। এ সব উক্তি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়—এদের ভিতরের মনোভাব এদের অতীত জীবনের ইতিহাস। এদের দৈহিক শাস্তি দিয়ে আমরা আমাদের প্রতিশোধ নেবার বাসনা পূর্ণ করতে পারি বটে, কিন্তু ঐভাবে

ওদের আচরণকে সমাজানুগ করা যায় না বা অপরাধমূলক আচরণের প্রতি এদের বীতস্পৃহ করাও যায় না। তাই অপরাধীদের জন্যে প্রয়োজন সংশোধনাগারে মনোবিজ্ঞান-সম্মত তত্ত্বাবধান ও শিক্ষা। তাদের জানিয়ে দেওয়া—অপরাধ-স্পৃহার জন্যে অবচেতন মনের কোন্ অবস্থা প্রকৃত দায়ী; কিসের তাড়নায় তারা অপরাধের মাধ্যমে আনন্দ পায় ইত্যাদি। এ ছাড়া অপরাধ প্রশমনের জন্যে প্রয়োজন সমাজ-সংস্কার, সমাজ-উন্নয়ন, কুসংস্কার ও অহেতুক বিধিনিষেধ বর্জন এবং মনের পরিপূর্তির সময়ে, অর্থাৎ শৈশবে উপযুক্ত ভাবে তত্ত্বাবধান করা। পিতৃহীন মাতৃহীন কিংবা সহায়হীন অনাথ শিশু অবহেলা এবং অনাদরের মধ্যে মানুষ হলে তার মধ্যে সমাজকে বিপর্যস্ত করে প্রতিশোধ নেবার আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠার সম্ভাবনা অধিক হয়। সুতরাং কি ভাবে এদের লালন-পালন করতে হয়, পিতামাতা এবং অভিভাকদের তা জানা প্রয়োজন। বয়ঃসন্ধির প্রাক্কালে মন যখন ভাবপ্রবণতায় ভরা থাকে তখন কিশোর কিশোরীদের রক্ষণাবেক্ষণে ত্রুটিবিচ্যুতি না হলে অনেক ধরনের অপরাধের সংখ্যা হ্রাস পাবে। শিশুর কাছে যদি পিতা-মাতা অপরাধ না করে, অভিভাবকেরা যদি তাদের উপর নির্ভরশীলদের কাছে অপরাধ না করে, সমাজ যদি তার অনুগতদের উপর অবিচার না করে, রক্ষক যদি ভক্ষকের অংশ গ্রহণ না করে তবেই প্রকৃতপক্ষে অপরাধের সংখ্যা অনেক হ্রাস পাবে।

অপরাধ ও অপরাধী*

অপরাধ মানুষের সামাজিক জীবনে একটা নৈমিত্তিক ঘটনা—এই বাস্তব অবস্থার উপর ভিত্তি করেই আধুনিক অপরাধ বিজ্ঞানের সূচনা ও ক্রমবিস্তার হয়েছে। তাই অপরাধ বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য—সমাজের শৃঙ্খলা কি ভাবে, কি নিয়মে মেনে চললে সবল ও আপদশূন্য মানব-সমাজ গড়ে উঠবে।

অপরাধ-বিজ্ঞানের মূলীভূত কারণের উপর নির্ভর করে বিজ্ঞানীরা তিনটি ধারা নির্ণয় করেছেন। প্রথমতঃ সামাজিক শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ রাখবার উদ্দেশ্যে আইনকানুন প্রবর্তন; দ্বিতীয়তঃ, অপরাধমূলক আচরণের কারণ নির্ণয় এবং তৃতীয়তঃ, অপরাধীর সংশোধনার্থে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিরূপণ। সুতরাং সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে নূতন আইন সৃষ্টি করা, পুরাতন আইনগুলিকে পরিবর্তিত করা, অপরাধমূলক আচরণের উৎস সন্ধান ও অপরাধীর কার্যকলাপ নিরোধের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন অপরাধ-বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু।

অপরাধ-বিজ্ঞানীদের গবেষণার প্রধান প্রতিপাদ্য হচ্ছে, অপরাধীর কার্যকলাপ বা অপরাধমূলক ব্যবহার অর্থাৎ আচরণ। অপরাধমূলক ব্যবহার বলতে কোনো এক বিশেষ ধরনের ব্যবহার বা আচরণ বুঝায় না। মানুষের সাধারণ ও সমাজ-অনুমোদিত ব্যবহারের একটা বিকৃতরূপ অপরাধীর ব্যবহারে দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ আমাদের ব্যবহারে যে সামাজিকতাবোধ পরিলক্ষিত হয়, অপরাধীর ব্যবহারে তার অবিদ্যমানতাই সুস্পষ্ট। কারণ, শৃঙ্খলাবদ্ধ সামাজিক রীতিনীতির অনুগামী যে কোনো আচরণ যখন শৃঙ্খলাহীন ও নীতিবিরোধী হিসাবে পরিবেশিত হয়, তখনই আমরা সেই আচরণকে অপরাধের পর্যায়ে ফেলে থাকি। সুতরাং

---

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন কর্ণধার স্বর্গীয় অধ্যাপক ডক্টর সুহৃৎ চন্দ্র মিত্রের উৎসাহে রচিত এবং "জ্ঞান-বিজ্ঞান" পত্রিকায় প্রকাশিত লেখকের রচনা দ্রষ্টব্য।

সাধারণ ও অপরাধমূলক ব্যবহারের মধ্যে মূল পার্থক্য হলো আচার-ব্যবহারের পরিবেশনে বিকৃতি কিংবা অপপ্রয়োগ। আমাদের আচরণের সুষ্ঠু প্রকাশ বিকৃত অথবা অপপ্রযুক্ত হওয়ার জন্যে মনের কর্ম-পদ্ধতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে দায়ী। মনের কার্যকারিতার উপর পরিবেশ ও বংশধারার প্রভাব অনস্বীকার্য। সুতরাং উক্ত উভয় ক্ষেত্রেই যে সব কারণগুলির বিশেষ উপস্থিতি মানুষকে অপরাধীরূপে রূপায়িত করে, সেগুলির বিশ্লেষণ ও প্রতিরোধ-কল্পনা অপরাধীর মানসচিত্র পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অপরাধ-বিজ্ঞানীদের সচেতন করে তুলেছিল। এই ভাবধারার জন্যে মূলতঃ ফ্রয়েডের অবচেতন বা নির্জ্ঞান মনের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধীয় তত্ত্ব, ভাষ্য এবং বহু পরীক্ষিত সিদ্ধান্তগুলি একান্তভাবে দায়ী।

মানুষ অপরাধী হিসাবে পরিগণিত হওয়ার পূর্বে তার জীবনের যে সব ঘটনা তার সেই অবস্থার জন্যে দায়ী, সেগুলির সমন্বয়ে একটি বিবরণী প্রস্তুত করা সম্ভব। অপরাধীর অতীত জীবনের ঘটনাবলী যে তাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে সেই পথে প্ররোচিত করে—সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নেই। মানুষ তার পরিবেশের যে পরিস্থিতিতে সহজ স্বাভাবিক ব্যবহার প্রকাশ করতে অক্ষম হয়, তার সঙ্গে অতীত জীবনের কোনো না কোনো ঘটনার যোগসূত্র পাওয়া যায়। এক কথায় বলতে গেলে, অপরাধ যে পরিস্থিতিতে সংঘটিত হয়, সেই পরিস্থিতি ও অপরাধী ব্যক্তির সম্পর্ক কোন এক অজ্ঞাত সূত্রে বাঁধা থাকে। সেই জন্যে ঐ পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া মাত্রেই সেই বিশেষ ব্যক্তিটি একই ধরনের দুষ্ট আচরণ প্রকাশ করে থাকে। অপরাধী ব্যক্তির মনে পোষিত কোনো সমাজ-বিরোধী ক্রিয়া ঐ বিশেষ পরিস্থিতিতে এসে প্রকাশ পাওয়ার সুযোগ পায়; অর্থাৎ পরিস্থিতি অগ্নিশলাকার মতো সঞ্চিত দাহ্য পদার্থের স্তূপে অগ্নি সংযোগ করে মাত্র। পরিস্থিতি অর্থে অনেক ক্ষেত্রে সুযোগ বুঝায়। অপরাধমূলক কার্যকলাপের প্রকাশ বহুলাংশে সুযোগের উপর নির্ভর করে। সুযোগ না পাওয়া অবধি কোনো একটি প্রবল ইচ্ছা ঐ ব্যক্তির মনের মধ্যে পোষিত হয়, কিন্তু কার্যকরী হওয়ার সুযোগ পায়

না। আবার কয়েকটি বিশেষ ধরনের পরিস্থিতি বা সুযোগ কতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ; সুতরাং মানুষ সেই বিশেষ ক্ষেত্রের সংস্পর্শে না এলে ঐ ধরনের অপরাধ করবার সুযোগ পায় না, যেমন যৌন অপরাধ ও বিভিন্ন বৃত্তিমূলক অপরাধ।

অপরাধমূলক কার্যকলাপ কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যক্তির জীবনযাত্রা প্রণালী, প্রতিবেশী বা সংসর্গের প্রভাব ও অন্যান্য অপরাধমূলক সুযোগ-সুবিধার উপর নির্ভর করে। শৈশব অবস্থায় জীবনধারণের উপযোগী অভ্যাসগুলি অপরাধমূলক হওয়ার ফলে সেগুলি কালে আচরণে পরিণত হয়ে থাকে। এই পর্যায়ে অপরাধীর শিক্ষাপদ্ধতি, প্রতিবেশীর আচরণ, বন্ধুবান্ধবের কার্যকলাপ, ন্যায়-অন্যায় বোধ, ছোটোখাটো অন্যায় প্রশ্রয় পাওয়া ও অপরাধীর সংসর্গে আসবার সুযোগ পাওয়া প্রভৃতি বিশেষভাবে দায়ী। সুতরাং ব্যক্তিগত জীবনের উপর সমাজের প্রভাব ও পরিবেশের প্রভাব পৃথক অথবা সমষ্টিগতভাবে মানুষকে অপরাধী করে তুলতে সাহায্য করে। সে-জন্যে সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনের বিপর্যয় মানুষকে দুষ্ট আচরণে প্রবৃত্ত করে অথবা সমাজ-শৃঙ্খলাবিরোধী জীবন যাপনে অভ্যস্ত করে তোলে।

সাধারণতঃ আইনবিরুদ্ধ কার্যগুলিকেই অপরাধ বলা হয়। আইনের গণ্ডীবদ্ধ কোনো কোনো কার্যের মধ্যেও অনেক ক্ষেত্রে অপরাধ প্রশ্রয় পেয়ে থাকে। প্রতিটি অপরাধমূলক কার্য সমপর্যায়ের নয়, অর্থাৎ সব অপরাধী সমাজের চোখে সমানভাবে দুষ্ট নয়। কোনো কোনো ব্যক্তি প্রায়ই এক ধরনের অপরাধ করে থাকে, আবার কেউ কেউ বিভিন্ন ধরনের অপরাধ করতেও নিরস্ত হয় না। ব্যক্তিভেদে অপরাধ একবার অথবা বহুবার সংঘটিত হয়ে থাকে। কোনো কোনো অপরাধীর কার্যকলাপের মধ্যে হিংস্র মনোভাবের পরিচয় বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। ওই হিংস্র বা পশুভাবের প্রকারভেদ বা মাত্রাভেদও বিভিন্ন অপরাধীর কার্যে লক্ষণীয় বস্তু। অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর কোনো কোনো অপরাধী বিশেষভাবে অনুতপ্ত হয়, আবার কোনো ক্ষেত্রে অনুশোচনার লেশমাত্র দেখা যায় না।

অপরাধ প্রবৃত্তি সহজাত নয়—এ বিষয়ে গবেষকগণ এক মত। কারণ অপরাধ স্পৃহার ভিত্তি একটিমাত্র মনোবৃত্তির উপর স্থাপিত নয়। তবে মানুষের বিভিন্ন প্রবৃত্তি এবং শারীরিক বা মানসিক চরিত্রগুলির অনুশীলনীর উপর অপরাধমূলক ব্যবহারের প্রকাশ যে সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল, একথা সকলেই স্বীকার করেন। অনুশীলন ক্ষমতা প্রয়োজনীয় শারীরিক এবং মানসিক সম্পদ অনেক ক্ষেত্রে পিতৃপিতামহ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত—এই সিদ্ধান্তের উপর কোনো কোনো গবেষক গুরুত্ব আরোপ করে তার সাহায্যে অপরাধীর কার্যকলাপ ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেন। অবশ্য বহু ক্ষেত্রেই প্রমাণিত হয়েছে যে অপরাধমূলক আবহাওয়া বা পারিবারিক রীতিনীতি পরিবারস্থ শিশুদের সম্পূর্ণভাবে প্রভাবান্বিত করবার ফলেই অপরাধপ্রবণ পরিবারের সৃষ্টি হয়ে থাকে। কারণ, শৈশব অবস্থাতেই সমাজের সঙ্গে, বাস্তব জীবনের সঙ্গে শিশুর পরিচয় যদি শৃঙ্খলার ভিত্তিতে গড়ে না ওঠে তাহলে ভবিষ্যৎ জীবন বিশৃঙ্খল হওয়াই স্বাভাবিক। যেমন—খাবার ইচ্ছা শিশুর সহজাত, কিন্তু খাদ্যগ্রহণ ও খাদ্য সংগ্রহের পদ্ধতি শিক্ষাধীন। সুতরাং শিক্ষা প্রণালীর উপর শিশুর আহার্য সম্পর্কীয় আচরণগুলি নির্ভরশীল। এই বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণের মুহূর্তগুলিতে পরিবারের প্রভাব যেমন অনস্বীকার্য তেমনি ক্ষুধার নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে গর্হিত অথবা অপরাধমূলক আচরণ প্রকাশের জন্যেও পরিবারের শিক্ষা-প্রভাব অনস্বীকার্য।

অপরাধী সম্পর্কে গবেষণার প্রথম অবস্থায় বিজ্ঞানীরা অপরাধীদের শারীরিক ত্রুটির উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। অপরাধীদের অনেকের মধ্যেই শারীরিক ত্রুটিবিচ্যুতি বা আকৃতিগত বিকৃতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অনেকের মতে, দেহের শ্রীহীনতা অপরাধ সংঘটিত হওয়ার উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষতঃ যৌন অপরাধগুলির সঙ্গে দৈহিক দুষ্ট ভঙ্গীমার একটি সম্পর্কের কথা অনেকেই প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের যুক্তি অনুসারে, সমাজে এই বিকৃত দেহভঙ্গীমা ঘৃণা ও ভীতির উদ্রেক করে বলে বিকৃতদেহী ব্যক্তি সাধারণভাবে যৌনতৃপ্তি লাভে বঞ্চিত হয় ও অন্যায়ভাবে সুযোগ সৃষ্টি করে

যৌন পরিতৃপ্তির সময় অপরাধের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। বিচক্ষণ দৃষ্টিতে দেখতে গেলে দুষ্ট ভঙ্গীমা কোনো ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষভাবে দায়ী নয় বরং ওগুলির উপর পরিবেশের প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষভাবে দায়ী।

নালীবিহীন গ্রন্থিরসের স্বাভাবিক ক্ষরণ না হওয়ার ফলে দেহের ও মনের অপরিণত অবস্থা বা অতিরিক্ত বৃদ্ধি স্বভাবতঃ যে সব মানসিক প্রতিক্রিয়ার স্বৃষ্টি করে, সেগুলি কয়েকটি ক্ষেত্রে বিপথে যাবার সহায়ক হয়ে দাঁড়ায়। বয়সোচিত সাধারণ বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়ার ফলে সমাজ বা পরিবারের পক্ষে এদের সমস্যা দূরূহ হয়ে ওঠে এবং প্রায় ক্ষেত্রেই এদের জীবন বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে।

বিভিন্ন অপরাধের পক্ষে বয়সের বিভেদ অনুকূল। কারণ শক্তি, সামর্থ্য, চাতুর্য ও অন্যান্য কৌশল বয়স অনুযায়ী প্রয়োগ করা সম্ভব। তবে বয়স অনুযায়ী অপরাধের প্রকার ভেদ নির্ণয় এখনও সম্ভব হয় নি এবং এ কথা সবাই স্বীকার করেন যে, অপরাধের প্রকার ভেদের সঙ্গে বিভিন্ন বয়সের একটা সামঞ্জস্য আছে। ছোটখাটো চুরি কিশোর অপরাধীরাই বেশি করে। রাহাজানি, নারীহরণ, ধর্ষণ, ডাকাতি ও বিভিন্ন পেশাগত অপরাধ যুবক ও মধ্যবয়সীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সেও যৌন-অপরাধের দৃষ্টান্ত নিতান্ত কম নয়। যারা অপরাধ-প্রবণ তারা সাধারণতঃ কিশোর বয়স থেকে শুরু করে ৩০।৩৫ বছর পর্যন্ত একাধিক অপরাধ করে থাকে। সাধারণতঃ নারী-অপরাধীর সংখ্যা কম। অবশ্য এর অন্যতম কারণ, সমাজে নারীর অনেক স্থবিধা। বহু-ক্ষেত্রেই নারী অপরাধমূলক কার্যে সহায়তা করবার পর ধরা পড়ে না। বয়সের তারতম্য অনুসারে পুরুষ অথবা নারীর অপরাধের কোনো নিশ্চিত প্রকার ভেদ করা যায় না।

জীবনযুদ্ধের পটভূমিকায় মনের গতি-প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণতঃ দু-রকমের অপরাধী দেখা যায়। প্রথমতঃ অনেকে কোনো অজ্ঞাত ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে অপরাধমূলক আচরণ প্রকাশ করে থাকে। দ্বিতীয়তঃ অনেকে অপরাধ করে জীবিকা অর্জনের জন্যে। এদের কাছে

অপরাধটা পেশা। এরা অপরাধকে গর্হিত মনে করে না, বরং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হিসাবে গর্ব অনুভব করে।

অপরাধী-সমাজে অপরিচিতের প্রবেশাধিকার বিষয়ে ঐ সমাজের নেতৃস্থানীয়েরা বিশেষ সচেতন থাকে। বিশেষভাবে অনুসন্ধান না করে অথবা অন্য কোনো অপরাধীর সমর্থন না পেলে অপরাধী-সমাজে অপরিচিতের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ। সাধারণতঃ নেতৃস্থানীয় অপরাধীরা আশ্রয়হীন, সহায়হীন ও অপরিণত বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের অপহরণ করে এনে নিজেদের সমাজের অধিবাসী হিসাবে গড়ে তোলে। অনেক ক্ষেত্রে কিশোরদের ভাবপ্রণতার সুযোগ নিয়ে তাদের জীবনের অভাব অভিযোগ-জনিত উত্তেজনা অপরাধমূলক আচরণের মাধ্যমে প্রশমিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়ে প্রবীণ অপরাধীরা নিজেদের সমাজে নবীন অপরাধীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে থাকে।

কতকগুলি ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মনের অসুস্থতা বা বিকৃত মানসিক ক্রিয়াপদ্ধতি অপরাধ প্রবণতার মূল উৎস। উপরিউক্ত শ্রেণীভেদে এরা প্রথম পর্যায়ে পড়ে। এই শ্রেণীর অপরাধের কাছে অপরাধীর কারণ অজ্ঞাত থেকে যায়। অপরাধ-জনিত কার্যকলাপ থেকে এরা কিছুমাত্র আর্থিক লাভবান হয় না। মানসিক অসুস্থতার প্রভাবে যেখানে অপরাধমূলক আচরণ প্রকাশ পায় সেখানে অসুস্থতার মূল কারণ অতৃপ্ত-বাসনা। এই অতৃপ্ত বাসনার পরিতৃপ্তি সমাজ-বিরোধী হিসাবে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রত্যাহত হয়ে নির্জ্ঞান মনে সক্রিয় অবস্থায় অবস্থান করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে, এই অতৃপ্ত বাসনাগুলি আদিম প্রবৃত্তি-সঞ্জাত। সুতরাং চেতন মনের বিচার বুদ্ধি সাময়িক ভাবে ঐ অজ্ঞাত ও অপরিতৃপ্ত বাসনার কাছে পরাস্ত হওয়ায় ফলে, ব্যক্তি নিজের অজ্ঞাতে অপরাধমূলক কার্যে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং অপরাধের মাধ্যমে নির্জ্ঞান মনের ইচ্ছার সন্তুষ্টি সাধন করে। এই ক্ষেত্রে কার্যের সম্পাদনাই হয় একমাত্র লক্ষ্য এবং কার্যের ফললাভ বিচারে এই শ্রেণীর অপরাধী সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে। এই শ্রেণীর অপরাধীরা সাধারণতঃ জীবিকার্জনের উদ্দেশ্যে অপরাধ করে না।

মানসিক অসুস্থ ব্যক্তির অজ্ঞাত অসন্তুষ্টির প্রকাশ সম্পূর্ণ কাল্পনিক জগতে কেন্দ্রীভূত হয় অথবা বাস্তব জগতের কোনো প্রতীকী ঘটনার উপর আরোপিত হয়। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে অসুস্থ ব্যক্তি বাস্তব জগৎ থেকে স্বীয় কামনা সম্পূর্ণ ভাবে অপসারিত করে আত্মকেন্দ্রী হয়, অর্থাৎ সম্পূর্ণ বাস্তব জ্ঞান রহিত হয়ে যায়। কখনও এরা মনে করে যে তাদের কার্যকলাপ কোনো অলৌকিক শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। নিজেকে স্বীয় রাজ্যের অধীশ্বর জ্ঞানে সে অভীষ্ট সাধনের পথে সমস্ত বাধা নিষেধ অগ্রাহ্য করে এবং ঐ ধরনের কার্যগুলিকে সে যথেষ্ট যুক্তি-যুক্ত মনে করে। তার কোনো ইচ্ছার পরিপূরণ করার সময়ে সে বাহ্য জগতের নিয়ম লঙ্ঘন করছে কিনা, সে সম্বন্ধে সে মোটেই সচেতন নয়। নিজেকে কোনো বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অথবা প্রভূত অর্থশালী বা বিরাট প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিজ্ঞানে সে নিজেকে কেন্দ্র করে নানারূপ ধারণার সৃষ্টি করে এবং তদনুযায়ী বিভিন্ন কার্যে লিপ্ত হয়। তার (ভ্রান্ত) ধারণায় শৃঙ্খলা বলতে যা বুঝায় সেটিকেই সে সমাজের শৃঙ্খলা ভাবে। কারণ সে জানে, সে নিজেই সমাজের দণ্ডমুণ্ডের অধিকর্তা। দ্বিতীয়োক্ত ক্ষেত্রে অসুস্থ ব্যক্তি বাহ্যজগৎ এবং বাহ্য জগতে স্বীয় অবস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন থাকে। এই ধরনের অসুস্থ ব্যক্তিদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধ তাদের নির্জ্ঞান মনের কোনো অচরিতার্থ প্রবৃত্তির চরিতার্থতা বা প্রকাশের প্রতীক চিহ্ন, অর্থাৎ তার দ্বারা অনুষ্ঠিত সমাজবিরোধী আচরণের সমধর্মী অসামাজিক ইচ্ছা তার মনে প্রকট। নির্জ্ঞান মনের প্রতিটি ইচ্ছা আদিম প্রবৃত্তিমূলক এবং সেগুলি প্রকাশ পাওয়ার জন্যে প্রতি মুহূর্তেই সচেষ্ট। এই গুলির নগ্ন প্রকাশ অসামাজিক ও শৃঙ্খলাহীন, তাই এরা মনেরই বাধা দেবার শক্তির কাছে বাধা পায় এবং যার পরিণতিতে শুরু হয় মানসিক দ্বন্দ্ব। মনের বাধা দেবার শক্তির কর্ম পদ্ধতি চেতন মনের অগোচরে থাকে এবং যাদের বাধা দেয় তারাও চেতন মনের কাছে অজ্ঞাত। তাই মানসিক দ্বন্দ্বের প্রভাব চেতন মনের কার্যকলাপগুলিকে প্রভাবান্বিত করা সত্বেও কোন্টি কি ভাবে করে এবং কেমনভাবে করে তা বুঝে ওঠা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়

না। এ জন্যেই অপরাধমূলক প্রতীকী কার্যগুলি রহস্যাবৃত থেকে যায়। অপরাধী বুঝতে পারে না, কেন সে গর্হিত বা সমাজবিরোধী কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলছে। অনেক ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর অপরাধীরা নিজেদের শাস্তি দেবার অথবা নিজেদের লোক চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করবার অদম্য ও অজ্ঞাত ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে অপরাধ করে। অনেক ক্ষেত্রে আবার ভয়ানক উত্তেজনাপূর্ণ কোনো অসামাজিক কার্যের মাধ্যমে অপরাধী নিজের কোনো অজ্ঞাত উত্তেজনার প্রশমন ঘটায়।

সাধারণতঃ মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিদের চিন্তাধারা অপরাধ-ধর্মী, কিন্তু যতক্ষণ না ঐ ব্যক্তি সেগুলি কার্যে পরিণত করে ততক্ষণ অপরাধ সংঘটিত হয় না বা আইনের চক্ষে সে অপরাধী প্রতিপন্ন হয় না। মানসিক দ্বন্দ্বের পরিণাম অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানসিক অসুস্থতায় সীমাবদ্ধ থাকে বলেই সমাজে অপরাধীর সংখ্যা প্রকৃতপক্ষে কম, অন্যথায় অপরাধীর সংখ্যা যে কি ভাবে বৃদ্ধি পেতো তা কল্পনাতীত। স্টকহল্মের নোবেল ইন্স্টিটিউটে ডাঃ স্টিগ অ্যাকারফেল্ড মানসিক রোগীদের রক্ত পরীক্ষার যে নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন তার সাহায্যে অপরাধীর দেহের রক্ত পরীক্ষা করে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত অপরাধী ও পেশাদার অপরাধীদের পৃথক করা সম্ভব। মানসিক অসুস্থতার সঙ্গে অপরাধের সম্পর্ক স্থির করবার জন্যেও ঐ গবেষণালব্ধ পদ্ধতি বিশেষ ফলপ্রদ।

কতকগুলি ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, কয়েকটি বিশেষ ধরনের মানসিক গঠনের বিন্যাস অপরাধী হওয়ার পক্ষে অনুকূল। যাদের মনের গঠন-বিন্যাস এই ধরনের, তারা সমাজের সমস্যা বিশেষ। এরা অপরাধী অথবা আত্মকেন্দ্রী শ্রেণীর মানসিক অসুস্থতায় জীবন অতিবাহিত করে। যারা অপরাধী হয়ে ওঠে তারা অবশ্য বাস্তবজ্ঞানশূন্য হয়ে যায় না; কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা কোনো প্রবীণ অপরাধীর কাছে থেকে আজ্ঞাধীন ভৃত্যের মতো জীবন যাপন করে। তা ছাড়া অপরিণত মন অপরাধ-প্রবণতার পক্ষে অনুকূল। অপরিণত বুদ্ধির বিচারে জীবন-যুদ্ধে ও সামাজিক জীবনে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার তাৎপর্য বুঝে ওঠা সম্ভব হয় না। এজন্যে জীবন ধারণের উপায় হিসাবে বাধা-নিষেধহীন

আইন-কানুন বর্জিত পরিবেশে গর্হিত জীবিকাগুলিতে তারা অস্বস্তি বোধ করে না। আদিম প্রবৃত্তির নগ্ন প্রকাশ সমাজ অনুমোদন করে না। সমাজের রীতিনীতি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্যে যে ধরনের বুদ্ধি-বিবেচনা ও বিচারশক্তির প্রয়োজন, অপরিপূর্ত মনে তা থাকে না। অনুকরণই তাদের শিক্ষার একমাত্র উপায়। তারা যা-কিছু দেখে সেগুলিই শেখবার চেষ্টা করে। জোর করে, ভয় দেখিয়ে বা লোভ দেখিয়ে এদের দিয়ে কোনো কাজ করিয়ে নেওয়া খুবই সহজ। সুতরাং এরা যে ধরনের পরিবার বা পরিবেশের প্রভাবে শিক্ষা পাবে, সেভাবেই এরা গড়ে উঠবে। অপরিণত বুদ্ধিসম্পন্ন হলেই যে অপরাধী হবে, একথা সর্বক্ষেত্রে সত্য নয়, তবে এই ধরনের মনের গঠন অপরাধ-ধর্মী আচরণে অভ্যস্ত হওয়ার পক্ষে অনুকূল।

অপরাধী-জীবনের শুরু ও স্বভাব-অপরাধীতে পরিণত হওয়ার জন্যে পরিবারের আবহাওয়া ও প্রতিবেশীর প্রভাব বহুলাংশে দায়ী। শিশুর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্যে ঐ দুইয়ের প্রভাব অনস্বীকার্য। পিতা-মাতা অথবা অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের জীবন-ধারণ ও জীবিকার্জন প্রণালী, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি সব কিছুই শিশু অনুকরণ করে। পরিবারের কলহপ্রিয়তা, অসৌজন্যতা, অনাদর, উত্তেজনা, নির্মম ব্যবহার ইত্যাদির প্রত্যেকটি শিশু চরিত্রে নেতিমূলক পরিবর্তন আনয়ন করে। এগুলির প্রত্যেকটি উত্তরকালে সমাজ-শৃঙ্খলার প্রতি বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করে থাকে। শিশুকাল থেকে পিতা, মাতা অথবা উভয়ের অনুপস্থিতি বা অভাববোধ অপরাধী-চরিত্র সৃষ্টির পক্ষে বিশেষ সহায়ক। সংসারের দারিদ্র্য, অভিভাবকের বেকার অবস্থা, অকালে সংসারের চাপে যে-কোনো উপায়ে অর্থোপার্জনের চেষ্টা ইত্যাদির প্রত্যেকটি অপরাধ প্রবণতার সহায়ক। নারী অপরাধীদের প্রত্যেকের জীবনেই এই ধরনের ইতিহাস পাওয়া যায়। কতকগুলি পরিবারে অল্প সংখ্যক লোকের আয়ের উপর চতুর্গুণ লোক নির্ভরশীল। এই পরিবারগুলির মধ্যে ঔদাসীন্য এবং নিস্পৃহ ভাব প্রতিক্ষেত্রেই বিদ্যমান। এই সব পরিবারে ছোট ছেলে-মেয়েদের নিয়মানুবর্তিতা, আচার-ব্যবহার বা রীতিনীতি সম্বন্ধে শিক্ষা

দেওয়ায় কেউ আগ্রহশীল নন। শিষ্টাচারের অভাব বা সহানুভূতির অভাব এই সব পরিবারের মধ্যে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এই পরিবেশে শিশু বা কিশোর নানারূপ অপ্রিয় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। এই ধরনের পরিবারের ছেলেমেয়েদের যৌনস্পৃহা, লোভ, স্বার্থপরতা, দুরভিসন্ধি ইত্যাদির প্রাবল্য দেখা যায় এবং এগুলির মূল কারণ যে শিক্ষার অভাব, সে বিষয়ে প্রত্যেকেই একমত। এই আবহাওয়ায় লালিতপালিত ছেলেমেয়েদের শেষ পরিণতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানসিক অসুস্থতা কিংবা পেশাদার অপরাধী হয়ে জীবনযাপন।

অপরাধ যাদের পেশা তাদের অতীত জীবন অনুসন্ধান করে জানা গেছে যে তাদের জীবনে প্রতিবেশী ও পরিবেশের প্রভাব বিশেষভাবে দায়ী ; কতকগুলি পরিবেশ-সৃষ্ট ঘটনা তাদের জীবনের গতিকে এই পথে পরিচালিত করেছে। জীবনের কোনো আকস্মিক বিপর্যয় (তাদের অস্তিত্বের স্বীকৃতি, আত্মসম্মান, মর্যাদা, আর্থিক স্বচ্ছলতা, সুখস্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদি সব কিছুর সঙ্গে) তাদের জীবনকে গর্হিত পথ, গর্হিত আচরণ ও গর্হিত জীবনযাত্রার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে দিয়েছিল। তার ফলেই এরা ধীরে ধীরে সাধারণ সমাজ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে অপরাধী সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। পারিবারিক বিপর্যয় বা সংসর্গ দোষের ফলে যখন কোনো ব্যক্তির অপরাধ-প্রবণতা ভীষণভাবে বেড়ে ওঠে তখন ঐ ব্যক্তির পক্ষে অপরাধী-সমাজ একমাত্র আশ্রয়স্থল। সেখানে অপরাধীর অনাদর হয় না, বরং তারা সম্মানের অধিকারী হয়ে থাকে। অপরাধী-সমাজে যারা প্রবীণ তারা এই সব আশ্রয়প্রার্থীকে তাদের সামর্থ্য ও দক্ষতা অনুযায়ী অপরাধের পথে জীবিকা অর্জনের উপায় ঠিক করে দেয় এবং সুযোগ-সন্ধান দিয়ে সাহায্য করে।

অপরাধী যে পর্যায়েরই হোক না কেন, সাধারণতঃ কোনো রকম বিবেচনা না করেই তাদের উপর সমাজ স্বভাবতঃ বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করে থাকে। অপরাধী উচিত শাস্তির নজীরে যা বিধান পায়, তার স্বভাব পরিবর্তন করবার পক্ষে অনেক ক্ষেত্রেই ঐ শাস্তি বিশেষ কার্যকরী হয় না। তা ছাড়া অপরাধীর উপর সমাজের সহানুভূতির অভাব বিশেষ

লক্ষণীয়। অপরাধীর অনুশোচনা আসা সত্ত্বেও, ভাল হওয়ার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সমাজের অবহেলা ও হেয় দৃষ্টি তাদের ঐ পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সমাজের সহানুভূতি না পাওয়া ও সমাজচ্যুত হয়ে অপরাধীর সংসর্গের আওতায় বাস করতে বাধ্য হওয়াই পেশাদার অপরাধীতে পরিণত হওয়ার মূল কারণ। আচরণ সংস্কারের উপযুক্ত ব্যবস্থা এবং মনোবিজ্ঞান-সম্মত তত্ত্বাবধানের অভাবে কারাগার থেকে মুক্ত হওয়ার পরেও মানসিক উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে অনেককে অপরাধ করতে দেখা যায়। অপরাধী শাস্তি ভোগ করবার পর যাতে সমাজে প্রতিষ্ঠা পায় অথবা জীবনধারণের জন্যে তার উপযুক্ত জীবিকার সন্ধান পায়, সে বিষয়ে সমাজ ও শাসন ব্যবস্থার ঔদাসীন্যের ফলে কিছু সংখ্যক অপরাধী সমাজ এবং সরকারের উপর বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয় ও সমাজদ্রোহী কার্যের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করে। অপরাধী-সমাজের পুষ্টির জন্য পরোক্ষভাবে সরকার ও সমাজই দায়ী। কিশোর অপরাধীদের চিকিৎসা এবং সংশোধনের উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকলে তারা অতি সহজেই পেশাদার অপরাধীতে পরিণত হয়।

সমাজের শান্তি, শৃঙ্খলা ইত্যাদি বজায় রাখবার জন্যে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়াই যদি সমাজের যুক্তি হয়, তবে শাস্তি ভোগ করবার সময় অপরাধীর আচরণ ও তার মনের গঠনকে সমাজের উপযোগী করে পুনর্বিন্যস্ত করাই শাস্তির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। শাস্তি যদি সমাজের উপর তার বিদ্বেষ বাড়িয়ে দেয় তাহলে অপরাধীকে শাস্তি দেবার কোনো সামাজিক মূল্য থাকতে পারে না।

বর্তমানের অপরাধ-বিজ্ঞানীরা অপরাধের সংখ্যা হ্রাস করবার প্রচেষ্টায় অপরাধীর মানসিক চিকিৎসা এবং তার আচরণকে সমাজানুগ করবার উপায় নির্ণয়ে সচেষ্ট হয়েছেন। দণ্ডভোগের প্রাক্কালে কারাগারে আবাসিক জীবনের মুহূর্তগুলিতে অপরাধীদের মানসিক উন্নয়ন ও অপরাধমূলক কার্য বর্জন করবার বিভিন্ন উপায়ও উদ্ভাবিত হয়েছে। অপরাধীর প্রতি প্রতিহিংসার মনোভাব দেখানো বর্তমানে অনেক পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। অপরাধীদের সমাজে পুনর্বসতির জন্যে পল্লীর

অধিবাসী ও সরকারের পদস্থ কর্মচারিগণ বিশেষ তৎপর হয়ে উঠেছেন। এই চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। বিভিন্ন ঔষধের আবিষ্কার যেমন অসুস্থদের স্বাস্থ্য ও পুনর্জীবন লাভ সম্ভব করে তুলেছে, অনুরূপভাবেই মনোবিদ্যার প্রযুক্তির ফলে প্রতিটি সম্ভাব্য ক্ষেত্রেই অপরাধীদের সুস্থ সমাজ জীবনে অভ্যস্ত করানো অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয় সম্ভব হয়ে উঠবে।

অপরাধ অনুসন্ধান*

[তথ্য সংরক্ষণ]

কোনো অপরাধ অনুষ্ঠিত হবার পর তদন্তকারীর সামনে থাকে ঘটনার স্থল ও ঘটনার চিহ্ন। অপরাধ সংঘটিত হওয়ার অব্যবহিত পরে অপরাধীর আত্মরক্ষা বা আত্মগোপন করা ছাড়া আর কিছুই করবার থাকে না। যাঁরা অপরাধ দমন করবার কাজে নিযুক্ত আছেন, তাঁদের কাজের একটি পর্যায় শুরু হয় অপরাধ ঘটে যাবার পর। এই সময় যে প্রশ্নটি মূর্ত হয়ে ওঠে, সেটি হচ্ছে—'অপরাধী কে?' অপরাধমূলক কাজটির জন্য দায়ী কে, এই বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত না হলে অপরাধীর শাস্তি বিষয়ে বিচার করাও সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। কারণ কোনো ব্যক্তিকে আদালতে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য উপযুক্ত প্রমাণের প্রয়োজন। অপরাধ অনুন্ধান নির্ভুল না হলে প্রকৃত দোষী প্রমাণের অভাবে অব্যাহতি পেয়ে যায়। কাজেই এই বিষয়ে সব চেয়ে বড় কথা নির্ভুল অনুসন্ধান। অনুসন্ধান বিষয়ে সামান্য ভুল প্রকৃত দোষী ব্যক্তির অনুসন্ধানকে সুদূর পরাহত করে তোলে।

অপরাধ অনুসন্ধানের সমস্ত কিছুই নির্ভর করে কতকগুলি চিহ্ন বা সূত্রের উপর। যে স্থানে ঘটনাটি ঘটে, সে স্থানে এমন কতকগুলি চিহ্ন পড়ে থাকে যেগুলির উপর নির্ভর করে নির্ভুল অনুসন্ধানের মাধ্যমে অপরাধ ও অপরাধী বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভবপর হয়। সুতরাং অনুসন্ধান বিষয়ে অসাবধানতা অথবা নির্বুদ্ধিতার

---

*স্টকহলমের অপরাধ-অনুসন্ধান বিভাগের চীফ্ ইন্‌সপেক্টর Otto Wendel এবং 'ন্যাশানাল ইন্‌ষ্টিটিউট্ অফ্ টেক্‌নিকাল পুলিশ'-এর সহকারী Arne Svensson রচিত Crime Detection গ্রন্থটি (Cleaver-Hume Press, London.) হইতে লেখকদের রচনার অংশবিশেষ এবং মূল্যবান আলোকচিত্রগুলি এই পুস্তকে ব্যবহার করিবার অনুমতি এবং উৎসাহ দেওয়ার জন্য উক্ত গ্রন্থকারদ্বয়ের এবং পুস্তক প্রকাশকের কাছে লেখক বিশেষভাবে ঋণী।

দরুন সাফল্যের সম্ভাবনা আক্রান্ত হয়, ফলে অনুসন্ধানী লক্ষ্যচ্যুত হয়ে পড়েন।

অনুসন্ধানের শুরুতে তদন্তকারীর প্রথম ও প্রধান কর্তব্য ঘটনাস্থলটির সংস্থান সংরক্ষণ; অর্থাৎ অপরাধ অনুষ্ঠিত হবার পর সেখানে উপস্থিত হয়ে অকুস্থলকে যেমন ভাবে পাওয়া গেল সেটিকে ঠিক তেমনি-ভাবে রাখা। এই বিষয়ে পূর্বকল্পিত কোনো পন্থা বা বাঁধাধরা নিয়মকে কাজে পরিণত করবার নির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি নেই। কারণ, স্থান, কাল, অপরাধের গুরুত্ব ও প্রকার ভেদে অকুস্থল সংরক্ষণের কর্মপদ্ধতি পরিবর্তন সাপেক্ষ। তদন্তকারী বা অনুসন্ধানীর বুদ্ধি, বিবেচনা ও বিচক্ষণতাই এই ব্যাপারে একমাত্র সহায়ক। এই জন্যে যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে অনুসন্ধান না করতে পারলে পরবর্তী সিদ্ধান্তগুলি সম্পূর্ণ বিপরীত-মুখী হয়ে দাঁড়াতে পারে। যে স্থানে অপরাধ ঘটেছে সেই স্থানে ছড়িয়ে থাকে অনুসন্ধানের উপযোগী বহু প্রয়োজনীয় সূত্র—যেমন, অপরাধীর হাতের ছাপ, পায়ের ছাপ, গতিবিধির নির্দেশ, ফেলে-যাওয়া জিনিসপত্র ইত্যাদি। অকুস্থলকে পৃথকভাবে সংরক্ষণ না করতে পারলে এই তথ্যগুলি কৌতূহলী ব্যক্তিদের অজ্ঞতাবশতঃ স্থানচ্যুত বা বিনষ্ট হতে পারে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয়েও থাকে। এমন কি কতকগুলি ক্ষেত্রে অপরাধী বা তার সহায়ক ব্যক্তিরা কৌতূহলী জনতার মধ্যে মিশে গিয়ে আত্মরক্ষার কাজ হাসিল করবার চেষ্টা করে। সন্দেহ-ভাজন ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে আটক অথবা নজরবন্দী রাখা, অনুসন্ধানের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। এরপর অনুসন্ধানীর কতক-গুলি কাজ নিয়মমত ও নির্দিষ্ট পন্থা অনুযায়ী করা প্রতি ক্ষেত্রেই প্রয়োজন।

ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর পর অনুসন্ধানীর প্রথম অনুসন্ধান কাজ হবে: অপরাধ অনুষ্ঠানের কাল অর্থাৎ কখন অপরাধটি ঘটেছে, এবং তার কতক্ষণ পরে খবরটি পাওয়া গেছে, খবরটি কি ভাবে এসে পৌঁছেছে এবং কে সর্বপ্রথম কি ভাবে খবরটি জানতে পেরেছে তা সংগ্রহ করা। অনুসন্ধানীর দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে, যে জায়গাটিতে অপরাধটি

ঘটেছে তার একটি বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করা। যদি খোলা জায়গায় হয়ে থাকে তাহলে তার চার পাশে কি কি জিনিস পড়ে আছে, (বিশেষ-ভাবে চোখে পড়ে এমন কোনো জিনিস সহ) তার বিবরণ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করে রাখা। ক্যামেরার সাহায্যে অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি বস্তুর অবস্থানের চিত্র গ্রহণ করে নেওয়াই বাঞ্ছনীয়। বাড়ির মধ্যে বা ঘরের মধ্যে ঘটনাটি ঘটে থাকলে জানালা, দরজা, ঘরের আসবাবপত্র, সেই ঘরের সংলগ্ন অন্য ঘর বা বারান্দা ইত্যাদির পুঙ্খানু-পুঙ্খ বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে। এই ব্যাপারে সামান্য ভুলও ক্ষমার অযোগ্য। এই বিষয়ে একটি ঘটনা উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করা হলো :—

"একটি লোক গুলিতে মারা যায়। গুলিটি লেগেছিল তার মাথায়। গুলির আওয়াজে আকৃষ্ট হয়ে যারা লোকটির ঘরে গিয়ে পড়ে তারা পুলিসে খবর দেওয়ার পর তাকে হাসপাতালে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। লোকটিকে হাসপাতালে নিয়েও যায় একটি পুলিস। অনুসন্ধান বিভাগের লোক এর পর মৃত ব্যক্তির ঘর অনুসন্ধান করে কার্টিজের বাক্স ও একটি গুলি পায় কিন্তু ঘরের মধ্যে কোনো আগ্নেয়াস্ত্রের সন্ধান মেলে না। ঐ বাড়ির একটি হল ঘরের মধ্যে কোনো একটি তাকের উপর একটা নয়-মিলিমিটার আর্মি-পিস্তল পাওয়া যায়। ঐ পিস্তলটি যে ঘটনার দিন ছোঁড়া হয়েছে সে প্রমাণও পাওয়া যায়। সাধারণতঃ সিদ্ধান্ত করা হয় যে লোকটিকে খুন করা হয়েছে, কেন না মৃত ব্যক্তির কাছ থেকে অনেক দূরেই পিস্তলটি পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু আরও ভালভাবে অনুসন্ধান করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে এটি খুন মোটেই নয়, আত্মহত্যা। যে পুলিস কর্মচারীটি লোকটিকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল, সে তাড়াতাড়িতে হল ঘরের তাকের উপর পিস্তলটি তুলে রেখেছিল, এবং ঐ ব্যাপারটির উপর বিশেষ কোনোই গুরুত্ব দেয়নি।" কিন্তু তার এই সামান্য ভুল সমস্ত ব্যাপারটিকে কতখানি জটিল করে তুলেছিল, সেটা বলাই বাহুল্য। এ ছাড়া অপরাধীর ফেলে-যাওয়া অস্ত্রশস্ত্রাদি খুব সাবধানে নাড়াচাড়া করা অনুসন্ধানীর কর্তব্য।

কেন না, এই সব অস্ত্রশস্ত্রের গায়ে হাতের ছাপ, আঙ্গুলের ছাপ ইত্যাদি পাওয়া যায়।

প্রাকৃতিক আবহাওয়া সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হওয়াও এই ধরনের অনুসন্ধানের একটি বিশেষ অঙ্গ। অনেক ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ গন্ধের অবস্থিতি বিশেষ প্রয়োজনীয় তথ্য হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে।

হত্যা বিষয়ক অনুসন্ধানে আরও বেশি সাবধানতা প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে প্রাথমিক অনুসন্ধান শেষ হওয়ার পূর্বে মৃতদেহ একেবারে নড়ানো উচিত নয়। মৃতদেহ স্পর্শ করার সময় এমনভাবে করা উচিত যাতে কোনো ছোটখাটো চিহ্নও ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, মৃতদেহের আশে-পাশে কোনো জিনিস চিহ্নিত না করে নড়ানো মোটেই উচিত নয়। যে সমস্ত জায়গায় হাত বা পায়ের ছাপ পাওয়ার সম্ভাবনা, সেখানে কোনো তৃতীয় ব্যক্তির হাত বা পায়ের ছাপ যাতে না পড়ে সেদিকে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। অনেক সময় সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যে হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে, সেটি হত্যা, আত্মহত্যা বা দুর্ঘটনার পরিণাম—এই তিনটির মধ্যে কোনটি সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা স্থির করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রয়োজনীয় বিষয় হচ্ছে—অনুসন্ধানীর ধীর এবং নিরপেক্ষ তদন্ত। ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর পর পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে কোনো দ্রুত সিদ্ধান্ত অনেক ক্ষেত্রে নির্দোষ ব্যক্তির অভিযুক্ত হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

অপরাধ অনুসন্ধানের প্রথম পর্যায়ে অনুসন্ধানীর কোনগুলি করা উচিত এবং কোনগুলি করা উচিত নয়, সে সম্বন্ধে Stockholm-এর National Institute of Technical Police-এর দু-জন বিখ্যাত অপরাধতত্ত্ববিদ Svensson এবং Wendel তাঁদের Crime Detection পুস্তকে নিম্নলিখিত ১৪টি নির্দেশ দিয়েছেন অবশ্য-পালনীয় হিসাবে।

(১) ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে সর্বপ্রথম প্রতিটি নিষেধাজ্ঞা এবং নিয়মাবলীর কথা স্মরণ রেখে একটি অনুসন্ধানী মন তৈরি করতে হবে।

(২) শুরু থেকেই নিরপেক্ষ মনোভাব নিয়ে তদন্ত চালাতে হবে।

(৩) সম্ভব হলে কালবিলম্ব না করে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা বা তা করবার জন্যে যে পন্থা অবলম্বন করা দরকার বলে মনে হবে, বিনা দ্বিধায় তা সেরে ফেলতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করলে তার দেহে অপরাধ অনুষ্ঠানের কোনো চিহ্ন আছে কিনা তক্ষুণি দেখে নিতে হবে, তারপর সম্ভব হলে, অনতিবিলম্বে তার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে ফেলতে হবে।

(৪) যথেষ্ট সাবধানতার সঙ্গে ঘটনার সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ-ভাবে জড়িত ব্যক্তিদের জীবন যাতে বিপদগ্রস্ত না হয়, বা তারা নির্যাতিত না হয়, তার ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

(৫) ঘটনাস্থলের যে সমস্ত জায়গায় অপরাধ সংঘটিত হওয়ার চিহ্নগুলি পড়ে আছে সেগুলিকে অতি সাবধানতার সঙ্গে রক্ষা করতে হবে। অপ্রিয় পরিস্থিতির উদ্ভব হলেও যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার সেগুলি সম্পূর্ণ করতে হবে। যেমন, জায়গাটি দড়ির বেড়ায় ঘেরা, ঘরে হলে তার দরজায় তালা দেওয়া, দর্শকদের দৃষ্টি প্রতিহত করবার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। এই সংরক্ষণের কাজে বাড়াবাড়ি বরং ভালো, শিথিলতা বিন্দুমাত্র নয়। ঘটনাস্থল পথে হলে যানবাহন ও পথচারীদের গতিবিধি সে পথে রদ করে অন্য পথে পরিচালনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৬) অপরাধ সম্পর্কীয় তথ্যগুলি সংরক্ষণ করার জন্য তদন্তকারী ছাড়া অন্য ব্যক্তির উপস্থিতি অবাঞ্ছনীয়। সুতরাং ঐ তথ্য বা চিহ্নগুলি যাতে অপর কেউ নাড়াচাড়া না করে সেদিকে বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে। এ অনুসন্ধানের সময় নিজের অজ্ঞাতে যাতে এই ধরনের কিছু না ঘটে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা কর্তব্য।

(৭) ঘটনার সাক্ষী হিসাবে যে সমস্ত লোকের সন্ধান পাওয়া

যাবে তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবরণ সংগ্রহ করে তা লিপিবদ্ধ করে নিতে হবে।

(৮) প্রয়োজনবোধে উর্ধ্বতন অভিজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে এবং কোনো কিছু সাহায্যের বা কোনো উপদেশের প্রয়োজন থাকলে তা চেয়ে নিতে হবে।

(৯) হত্যা তদন্তের সময় নিহত ব্যক্তির দেহের অবস্থা ও অবস্থান উভয় বিষয়ে বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

(১০) 'গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে'—এই ধরনের মৃতদেহের গলায় দড়ি বা অন্য কিছুর ফাঁসটির বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি যাতে না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(১১) বিশেষজ্ঞরা তদন্তের জন্য ঘটনাস্থলে না আসা পর্যন্ত মৃতদেহ, প্রাপ্ত অস্ত্রশস্ত্রাদি, হাত বা পায়ের চিহ্ন ইত্যাদি যাতে যথাযথ ও অবিকৃত অবস্থায় থাকে তার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

(১২) উর্ধ্বতন অভিজ্ঞের ঘটনাস্থলে আসার পর তাঁর অবগতির জন্য অনুসন্ধানের ফলে প্রাপ্ত তথ্য বা চিহ্নগুলির যথোপযুক্ত উপস্থাপন করতে হবে।

(১৩) তথ্য বা চিহ্ন সংরক্ষণের কাজ নির্ভুল এবং নিয়মানুযায়ী হওয়া প্রয়োজন। এমন কিছুই করা উচিত নয় যাতে সাফল্যের সম্ভাবনা নিশ্চিহ্ন হয়। দ্রুত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা না করে কেবলমাত্র তথ্যাদির সংরক্ষণের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা, অনুসন্ধানের প্রথম পর্যায়ের প্রধান কাজ।

(১৪) সংবাদপত্রের প্রতিনিধি, সাধারণ দর্শক এবং উপস্থিত সাক্ষীদের সঙ্গে কোনো প্রকার অযথা আলোচনা সর্বতোভাবে অবাঞ্ছনীয়।

তদন্ত ও আনুষঙ্গিক প্রস্তুতি

অপরাধ অনুসন্ধানের প্রথম পর্ব হলো অপরাধ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন তথ্যের অনুসন্ধান। দ্বিতীয় পর্ব—অপরাধীর অনুসন্ধান। ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্যগুলির সাহায্যে প্রয়োজনীয় ও সঠিক তদন্তের মাধ্যমে, 'অপরাধী কে ?' এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব। তদন্তের কার্যপ্রণালী অত্যন্ত জটিল ও কষ্টসাধ্য। সার্লক হোম্‌স বা কিরীটী প্রমুখ কল্প-কাহিনীর তদন্তকারীদের মতো বাস্তব জগতের সত্যান্বেষীদের পক্ষে ধূমায়িত চায়ের কাপের অথবা চুরুটের ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে হঠাৎ-আসা বুদ্ধির ঝলক অপরাধীকে ধরিয়ে দিতে পারে না। তদন্তের প্রতিটি পদক্ষেপ নিয়মানুগ ও নির্ভুল না হলে সমস্যার সমাধান অসম্ভব এবং এই তদন্ত শ্রমসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ। ঘটনাটির বিষয়ে জানবার পর, ঠিক কতদিন পরে রহস্যের মেঘনাদ চিহ্নিত হবে—তদন্তকারীর পক্ষে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

তদন্তের শুরু থেকেই তদন্তকারীকে মনে রাখতে হবে যে—তার একমাত্র লক্ষ্য হলো 'সত্য অন্বেষণ'। ঘটনাটির অন্তর্নিহিত সত্য অন্বেষণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে করতে গেলে, সর্ব প্রথমে প্রাপ্ত তথ্য ও চিহ্নগুলির সাহায্যে এবং অন্যান্য খবরের উপর নির্ভর করে—ঘটনাটি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অথবা দুর্ঘটনাজনিত কি না, স্থির করতে হবে। যেমন ধরুন, একটা মৃতদেহ পাওয়া গেছে। মৃতদেহটি নদীর জলে ভেসে এসেছে। এ বিষয়ে সত্য অন্বেষণ করতে গেলে, আগে জানতে হবে যে ঐ লোকটি চান করবার সময় নিছক দুর্ঘটনা-বশতঃ ডুবে গেছলো, অথবা লোকটি আত্মহত্যা করেছিল। যদি দেখা যায় যে, ঐ দুইটির কোনোটিই তার মৃত্যুর কারণ নয়, তাহলে বুঝতে হবে যে লোকটিকে হত্যা করার পর অপরাধী প্রমাণ লোপ করবার অথবা ব্যাপারটিকে জটিল করে তোলার উদ্দেশ্যে মৃতদেহটিকে নদীতে ফেলে দিয়েছিল। এই অবধি উদ্‌ঘাটন করবার পর অন্যান্য তথ্য ও

খবরাখবরের সাহায্যে লোকটিকে কে বা কারা হত্যা করে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিল সে রহস্যের সমাধান সম্ভব হবে। সুতরাং ডিটেক্‌টিভ্‌ গল্পের নায়কের মতো দ্রুত সমাধান বাস্তব ক্ষেত্রে অসম্ভব। 'পুলিস বড়ো গেঁতো'—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেকে মন্তব্য করে থাকেন—"হুঁ! কবে খুন হয়েছে মশাই, আর পুলিস এখনও ঘুমুচ্ছে!" অথবা "জেরার ঠেলায় অন্ধকার কিন্তু আসল কাজ কতদূর হলো জানি না!"—ইত্যাদি। এ ধারণা কিন্তু ঠিক নয়। কারণ, অনুসন্ধান শেষ করতে প্রকৃতপক্ষে কতটা সময় লাগবে সত্যিই বলা যায় না। যেহেতু গল্পের বইয়ের মতো ঘটনার জাল বোনা আর ডিটেক্‌টিভকে দিয়ে উক্ত জাল খুলে ফেলা, বাস্তব জগতে একই লোকের দ্বারা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। গল্পের বইয়ের লেখক প্রথমে ঠিক করে নিয়ে থাকেন—কি ভাবে অপরাধী ধরা পড়বে কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে অনুসন্ধানের শেষ ধাপে না পৌঁছে অপরাধী যে কে—সেটির কল্পনাও অনেক সময় অসম্ভব বলে মনে হয়। অনুসন্ধানের কাজের সব কিছু দায়িত্ব, (অপরাধতত্ত্ব-বিদ্‌দের মতে) দু এক জনের উপর থাকাই যুক্তিযুক্ত। অবশ্য তাঁরা ইচ্ছা করলে অনেকের সাহায্য নিতে পারেন। অপরাধ-তত্ত্ববিদ্‌দের মতে, "অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট" কথাটি এই প্রসঙ্গে প্রযোজ্য।

তদন্তের প্রথম পর্যায়েই পড়ে চিত্র গ্রহণ। ঘটনা স্থলটির সংস্থান ও ঘটনাসংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য—যেগুলিকে বেশিক্ষণ রাখা সম্ভব নয়, সেগুলির প্রত্যেকটিকে সযত্নে ক্যামেরার সহায়তায় আলোক চিত্রে রক্ষা করা উচিত। প্রত্যেকটি ছবি এত নিখুঁত হওয়া উচিত যে ছবিগুলি দেখার পর কি ধরনের অপরাধ ও ঘটনাস্থলের অবিকল প্রতিকৃতি সন্ধানী দৃষ্টির মাধ্যমে ধরতে পারা সম্ভব হবে। কতগুলো ছবি নেওয়া প্রয়োজন—এ সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে যতগুলি প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি হলে ভালো ছাড়া মন্দ হবে না। তবে দক্ষ চিত্রগ্রাহকের সাহায্য এ বিষয়ে কাম্য। ক্যামেরার দৃষ্টিতে যেন কোনো চিহ্ন বাদ না পড়ে এ বিষয়ে চিত্র-গ্রাহককে সতর্ক হতে হবে। এই জন্যই অপরাধ

অনুসন্ধানের বা তদন্তের বিষয়ে আলোক-চিত্র গ্রহণের যথেষ্ট জ্ঞান থাকা চিত্র-গ্রাহকের বিশেষ প্রয়োজন।

চিত্র গ্রহণ শেষ করবার পর তদন্তকারীর কর্তব্য প্রতিটি তথ্য বা চিহ্নের সযত্ন সংগ্রহ। তদন্তকারীর গতিবিধি—এই প্রসঙ্গে এত সতর্ক হওয়া উচিত যেন ঘটনাসংশ্লিষ্ট প্রতিটি জিনিস দুষ্ট প্রভাবমুক্ত অবস্থায় থাকে। প্রতিটি তথ্যের সংস্থান সঠিকভাবে আঁকতে হবে এবং যেখানে মাপ নেবার প্রয়োজন সেখানে সুষ্ঠুভাবে সেটি লিখে নিতে হবে। এই সাবধানতার মূল কথা হচ্ছে—তদন্তের কোনো কাজই আন্দাজে করলে চলবে না, সেটা আপাতদৃষ্টিতে যতো তুচ্ছই মনে হোক না কেন।

তদন্তের প্রয়োজনে যদি কোনো ব্যক্তিকে জেরা করার দরকার হয় অথবা কোনো স্থান যদি তল্লাস করার প্রয়োজন হয় তাহলে সে কাজ অপ্রিয় হলেও অনতিবিলম্বে করা উচিত। অহেতুক বিব্রত করা বা তল্লাস করা বিষয়ে কেবলমাত্র এইটুকুই বলা সম্ভব যে পরিস্থিতির জটিলতার জন্য অনেক সময় অহেতুক কতকগুলি ব্যাপার ঘটে এবং এটাকে তদন্তকারীর স্বেচ্ছাকৃত ও নিষ্প্রয়োজনীয় বলে ধরে না নেওয়াই উচিত।

তদন্ত কার্যে অনেক সময় চিকিৎসকেরও সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন হয়। চিকিৎসক তাঁর ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করবার সময় যেন মনে রাখেন যে অপরাধ সম্পর্কীয় তথ্য সংরক্ষণ করা তাঁর অন্যতম কর্তব্য। কারণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভঙ্গিমা, চামড়ার রং, ক্ষত-স্থানের রং, গন্ধ ইত্যাদি কতকগুলি চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের উপর তদন্তকারীকে নির্ভর করতে হয়। মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করার জন্য প্রেরিত হলে, ব্যবচ্ছেদের সময় চিকিৎসকের সঙ্গে তদন্ত সম্বন্ধে অভিজ্ঞ কোনো ব্যক্তির থাকা যুক্তিযুক্ত বলে অপরাধ-তত্ত্ববিদরা মনে করেন। পাশ্চাত্য দেশে এই বিষয়টির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়।

তদন্তের সময় কতকগুলি যন্ত্রপাতির বিশেষ প্রয়োজন হয়। কেন না, ঘটনা স্থলের কোনো জিনিসই তদন্তের সময় ব্যবহার করা উচিত নয়। তদন্তের জন্য যাত্রা করার সময় লণ্ডনের মেট্রোপলিটান পুলিস-

বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত কর্মীর হাতে সমস্ত সরঞ্জামপূর্ণ একটি বাক্স দিয়ে দেওয়া হয়। এই বাক্সটিকে তাঁরা বলেন 'মার্ডার ব্যাগ'। লণ্ডনের স্কটল্যাণ্ডইয়ার্ড তদন্তের জন্য যে ধরনের বাক্স ব্যবহার করে থাকেন তার অবিকল প্রতিকৃতির ছবিটি দেখলেই এ সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া যাবে।

এ ছাড়া আঙ্গুলের ছাপ নেওয়ার জন্যে অন্যান্য সরঞ্জামপূর্ণ আর একটি বাক্সও দেওয়া হয়। অপরাধ সংশ্লিষ্ট ও ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত তথ্য বা চিহ্নগুলির সযত্ন ও যথাযথ সংরক্ষণই এই সমস্ত সাজসরঞ্জামের মূল উদ্দেশ্য। তদন্তের শেষে চিহ্নগুলিকে নিয়ে যাবার সময়, সেগুলি যাতে নষ্ট না হয়ে যায় সে-দিকে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। অনুসন্ধানীর হাতে লেগে কোনো কিছু যাতে নষ্ট না হয় সেই জন্যে ধরবার যন্ত্রও, অর্থাৎ, উপযুক্ত একটি চিমটেও বাক্সের মধ্যে থাকে। কোনো জিনিস যাতে অপর কোনো জিনিসের সংস্পর্শে না আসে, তাই রাখবার পৃথক ব্যবস্থাও বাক্সের মধ্যে করা থাকে। বাক্সের মধ্যে নিয়মাবলীর যে কাগজটি থাকে তাতে যা লেখা থাকে তার বাংলা অনুলিপি নীচে দেওয়া হলো।

(ক) তথ্য বা প্রমাণে সহায়ক বস্তুগুলিকে সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিকারক প্রভাবের কবল থেকে মুক্ত রাখতে হবে।

(খ) প্রাপ্ত প্রতিটি জিনিসের উপর লেবেল মারতে হবে।

(গ) যে কর্মী সেটাকে পেয়েছেন এবং ঠিক যেখান থেকে পেয়েছেন লেবেলের উপর তা লিখে রাখতে হবে।

(ঘ) সূক্ষ্ম বস্তু, যেমন চুল, সুতো ইত্যাদি কখনো প্যাকেটের মধ্যে ফেলে রাখবে না ; সযত্নে তা কাগজে মুড়ে প্যাকেটে রাখবে।

(ঙ) অনুপযুক্ত কোনো পাত্র বা আধারে কোনো জিনিস রাখবে না।

(চ) অপরিষ্কার আধার ব্যবহার করবে না।

(ছ) যে জিনিস সহজে ভেঙ্গে যেতে পারে তাকে উপযুক্ত সাবধানতার সঙ্গে রাখবে।

(জ) বুলেট বা ঐ জাতীয় কোনো জিনিস, যেগুলির উপর পরে কিছু

পরীক্ষা করার প্রয়োজন হতে পারে, সেগুলি তুলোর মধ্যে সযত্নে মুড়ে নিয়ে পিচবোর্ডের বাক্সে রাখবে।

(ঝ) লেখবার জন্য অস্পষ্ট পেন্‌সিল ব্যবহার করবে না।

(ঞ) সাধারণ কালিতে লেবেল লিখবে না।

(ট) এ্যাসিড জাতীয় জিনিস কাঁচের ছিপি দেওয়া বোতলে রেখে ছিপি বন্ধ করে ছিপির মুখে উপযুক্ত রবারের ফিতে জড়িয়ে রাখবে।

(ঠ) চুল, সুতো ইত্যাদি জিনিসগুলোকে কখনোই তুলোয় জড়িয়ে রাখবে না।

এইভাবে সাবধানতার সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবরণ সংগ্রহ করতে পারলে তবেই অপরাধীর সন্ধান সম্ভব হবে, নচেৎ অনিশ্চয়তা ও ভাগ্য এই দুয়ের উপর নির্ভর করা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না।

তদন্ত কার্যে তথ্যানুসন্ধান

অপরাধীর দেহ ঃ

অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সময় অপরাধীর দেহে যে সমস্ত জামা-কাপড় থাকে সেগুলির মধ্যে অপরাধ-সংঘটন সংশ্লিষ্ট অনেক কিছু তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এই তথ্যের অবস্থিতি সম্বন্ধে অপরাধী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অজ্ঞাত থাকে। এই কারণে এইগুলি নষ্ট করা সম্বন্ধেও তার কোনো চেষ্টা থাকে না। অপরাধের পর অপরাধীর দেহেও এমন কতকগুলি প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় যেগুলির সাহায্যে অতি সহজেই অপরাধীকে উপযুক্ত নির্ভরযোগ্য প্রমাণবলে অভিযুক্ত করা সম্ভব হয়। এগুলি অপরাধীর কাছে তুচ্ছ মনে হয়, অথবা এগুলির অবস্থিতি সম্পর্কে অপরাধীর অজ্ঞানতাই ঘটনার বেশ কয়েকদিন পর পর্যন্ত এগুলিকে অপরাধীর দেহে বিদ্যমান থাকতে সাহায্য করে। অপরাধীর জামাকাপড়, জুতোর ধুলো, হাত বা পায়ের বিশেষ ক্ষত, পেশাগত বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক দৈহিক চিহ্ন, নখের ময়লা, ঘড়ি, আংটি, চশমা প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদির মধ্যে অপরাধ সংশ্লিষ্ট বহু চিহ্ন লুকিয়ে থাকে। এই সব চিহ্নগুলির মধ্যে ঘটনাস্থলের ও ঘটনার ধরনের আভাস পাওয়া যায়। যেমন ঃ স্থানটির বৈশিষ্ট্য নির্দেশক ধূলাবালি, আবহাওয়া এবং পারিপার্শ্বিকতার নির্দেশসূচক তথ্য, ভাঙা কাঁচ বা কাঠের টুকরো, চটা-ওঠা রং, জামাকাপড় পোড়ার দাগ, বারুদের গুঁড়ো, মাথার চুল, গা-হাত-পায়ে নতুন ক্ষত ইত্যাদি। নারী ধর্ষণ অথবা ঐ ধরনের অন্যান্য অপরাধে অপরাধীর শিশ্নদেশে বহুক্ষেত্রে উৎপাটিত কেশের সন্ধান পাওয়া যায়।

আঙ্গুলের এবং হাতের ছাপ ঃ

ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত আঙ্গুলের ও পায়ের ছাপ অপরাধীর অনুসন্ধানের কাজে বিশেষ সহায়তা করে। অপরাধীকে চিহ্নিত করবার পক্ষে এইগুলি বিশেষ উপযোগী। এই আঙ্গুলের এবং হাতের ছাপের সঙ্গে

সংরক্ষিত দাগী আসামীর আঙ্গুলের বা হাতের ছাপের মিল পাওয়া গেলে ঐ আসামীকে অভিযুক্ত করা বা ওর উপর অন্যান্য অনুসন্ধান করা সহজ হয়ে উঠে। বিভিন্ন ধরনের অপরাধে কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে অনুসন্ধান করলেই আঙ্গুল বা হাতের ছাপ পাওয়া যায়। যেখানে অপরাধী কোনো বাড়ির মধ্যে লুঠতরাজ করেছে সেখানে অপরাধীর প্রবেশ পথের বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের ছাপ পাওয়া স্বাভাবিক। ভাঙ্গা দরজার কব্জার ওপর, কুলুপ আটকাবার জায়গাতে, বা তার কাছাকাছি জায়গাতেও প্রায় ক্ষেত্রেই আঙ্গুল বা হাতের ছাপ পাওয়া যায়। প্রবেশ পথের ছাপ থেকেই বোঝা যায় যে অপরাধী এই ধরনের প্রমাণ সম্বন্ধে কতখানি সচেতন—সে খালি হাতে ছিল অথবা ছাপ যাতে না পড়ে সে বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল। জানালার ভাঙা কাঁচেও এই ধরনের ছাপ যথেষ্ট পাওয়া যায়। যেখানে জানালার মধ্যে দিয়ে অপরাধী নিজের প্রবেশ পথ করেছে, সেখানে জানালার নানা জায়গায় সুস্পষ্ট ছাপের সন্ধান পাওয়া যায়। ঘরের আলোর সুইচ, টেবিল ল্যাম্প, কাগজ, ব্লটিংপ্যাড, ইত্যাদির মাঝখানে অনেক সময়েই লুকিয়ে থাকে অপরাধীর অজ্ঞাতসারে রেখে-যাওয়া চিহ্ন।

অপরাধকার্য শেষ হয়ে যাবার পরই অনেক সময় অপরাধী হাতের দস্তানা খুলে ফেলে। এই জন্যে অপরাধীর পালিয়ে যাবার রাস্তায় যে সমস্ত জিনিস পড়ে, সেগুলির প্রত্যেকটির মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হাত বা আঙ্গুলের ছাপ খোঁজ করা বিনা দ্বিধায় প্রয়োজন। ঘটনাস্থলের প্রতিটি আসবাবপত্র অনুসন্ধানের সহায়ক হয়ে দাঁড়াতে পারে, কেন না, এগুলোর গায়েও ছাপ পাওয়া যায়। এই ছাপ তোলবার জন্য আলোকচিত্রের সাহায্য নেওয়া শ্রেয়। যেখানে ছাপ অস্পষ্ট সেখানে অন্য পদ্ধতিতে ছাপটি স্পষ্ট করে নেবার পর ছবি নেওয়া উচিত। হাতের বা আঙ্গুলের ছাপ যিনি সংগ্রহ করবেন তাঁর হাতে দস্তানা না থাকাই বাঞ্ছনীয়, কেন না, নানান্ কারণে এই দস্তানাটি তাঁর কাজের শত্রু হয়ে দাঁড়াতে পারে। যে ধরনের এবং যতগুলো ছাপই ঘটনাস্থলে পাওয়া যাবে তার প্রত্যেকটিই সযত্নে সংগ্রহ করে রাখা সর্বাগ্রে কর্তব্য।

সাধরণতঃ তিন রকম অবস্থায় আঙ্গুলের বা হাতের ছাপগুলো পাওয়া যায়। নরম বা কাদা জাতীয় পদার্থের উপর হাত রাখার ফলে যে ছাপ থেকে যায়, সেগুলো নরম অবস্থাতেই পাওয়া যেতে পারে। সাবান, আলকাতরা, জ্বলন্ত মোমবাতি, মোহরের গালা ইত্যাদির সংস্পর্শে অপরাধী আসার ফলে ঐ ধরনের ছাপ পাওয়া যায়। রক্ত, মুখে মাখবার পাউডার, ধুলো, লেখবার কালি, তেল ইত্যাদি অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সময় বিভিন্ন ঘটনাচক্রে অপরাধীর হাতে লাগতে পারে, ফলে অন্য কোথাও হাত রাখলেই অপরাধীর হাতের ছাপ পড়ে। এই ধরনের ছাপকে একটি শ্রেণীতে ফেলা হয়। চামড়ার ভেতরে তৈলাক্ত পদার্থ সৃষ্টিকারী এক প্রকার গ্রন্থি আছে। হাতের চেটোতে এই ধরনের গ্রন্থির কার্যকারিতা দেখা যায় না। কোনো জিনিস খুব জোরে চেপে ধরলে আঙ্গুলের মাথার দিকে এই গ্রন্থিরসের ক্ষরণের দরুন ঐ জায়গাটুকুর ছাপ পাওয়া যায়। অপরাধীর ফেলে-যাওয়া অস্ত্রশস্ত্রে এই ধরনের ছাপ পাওয়া স্বাভাবিক। এ ছাড়া খুব মসৃণ বা পালিশ-করা জায়গাতে যে ধরনের ছাপ পড়ে সেগুলো খুবই অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। শেষোক্ত দুই ধরনের ছাপই খুব অস্পষ্ট এবং এই জন্য অনেক সময় খালি চোখে ধরা পড়ে না।

অস্পষ্ট ছাপকে স্পষ্ট করে নেবার জন্য অনেক রকমের জিনিসের সাহায্য বর্তমান যুগে নেওয়া হয়ে থাকে। কি ভাবে অস্পষ্ট ছাপকে স্পষ্ট করে নেওয়া যায় তার দু-একটা পদ্ধতি সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা হলো।

অস্পষ্ট ছাপের উপর কোনো পদার্থের মিহি গুঁড়ো ছড়িয়ে স্পষ্ট করে তোলা সম্ভব। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ তাঁদের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে গুঁড়ো পদার্থ নির্বাচন করে থাকেন। সাধারণতঃ এ্যালুমিনিয়াম পাউডার, ভুসোকালির গুঁড়ো, পারদ, খড়িমাটি ইত্যাদি এই কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এ্যালুমিনিয়াম পাউডারের সাহায্যে অস্পষ্ট ছাপের ছবি পেতে গেলে প্রথমে একটি খুব নরম ও সম্পূর্ণভাবে শুকনো চুলের-তৈরি বুরুশে বেশ ভালো করে এই পাউডার লাগিয়ে

নিতে হবে তারপর কোনো শক্ত জিনিসের গায়ে ঐ বুরুশটিকে আস্তে আস্তে ঠুকে নিয়ে লেগে-থাকা পাউডার এমনভাবে ঝেড়ে ফেলতে হবে যাতে খুব অল্প পরিমাণ পাউডার ঐ বুরুশের গায়ে লেগে থাকে। এখন ঐ অস্পষ্ট ছাপটির উপর দিয়ে বুরুশটিকে আস্তে আস্তে টেনে নিয়ে গেলেই ছাপটির যে সমস্ত জায়গায় চিট বা ময়লা লেগে আছে সেই জায়গা-গুলোতে পাউডার আটকে যাওয়ায় ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ওপর থেকে পাউডার ছড়াতে গেলে আঙ্গুলের ছাপ নষ্ট হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। আঙ্গুলের বা হাতের তেলোর যে ছাপ আমরা পেয়ে থাকি সেগুলো ঐ জায়গার চামড়ার গায়ে যে সামান্য উঁচু লম্বা দাগগুলো আছে সেইগুলোর দুটো দাগের মাঝখানের জায়গা নিচু বলে ঐ জায়গাগুলোর ছাপ আসে না। পাউডার বেশি হয়ে গেলে দুটো উঁচু দাগের মাঝখানের ফাঁকা জায়গা ভরাট হয়ে যাওয়ায় উঁচু ও বাঁকা লাইনগুলির পৃথক সত্তা নষ্ট হয়ে যায়। কাঁচ বা অন্যান্য মসৃণ জায়গা থেকে এই পাউডারের সাহায্যে খুব সহজেই ছাপ নেওয়া যায়। তবে ছাপ নেওয়ার সময় জায়গাটি শুকনো না থাকলে পাউডারের সাহায্যে ছাপ তোলার অসুবিধে আছে।

হোয়াইট লেড্ নামক এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থের সহায়তায় চর্বিযুক্ত বা তৈলাক্ত জায়গায় ছাপ সহজেই স্পষ্ট করে তোলা যায়। কাগজ বা কোনো সাদা জিনিসের ওপর থেকে ছাপ স্পষ্ট করবার সময় এই পদার্থটি মোটেই উপযুক্ত নয়। এক্ষেত্রে অস্পষ্ট ছাপের উপর খুব সন্তর্পণে হোয়াইট লেডের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিতে হয়। অবশ্য এলো-মেলো ভাবে ছড়ালে কোনো ফল পাওয়া যাবে না, সেই জন্যে যে-কোনো একদিক থেকে ছড়ানোই রীতিসম্মত। কারখানার যন্ত্রপাতি, বেকালাইট, প্লাস্টিকের জিনিস, খাবার বাসনপত্র ইত্যাদির উপর থেকে হোয়াইট লেডের সাহায্যে ছাপ নেওয়া সম্ভব। হোয়াইট লেড নিয়ে কাজ করবার সময় মনে রাখতে হবে যে এটি বিষাক্ত জিনিস। কাগজের উপর থেকে অস্পষ্ট ছাপ স্পষ্টভাবে পেতে গেলে আয়োডিন বাষ্পের সাহায্যে নেওয়া হয়ে থাকে। সিল্‌ভার নাইট্রেট্ নামে এক প্রকার রাসায়নিক

পদার্থও এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

খুন জখম, নৃশংসভাবে হত্যা, নারী-ধর্ষণ ইত্যাদি অপরাধে অপরাধীর হাতে আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত লেগে যায়। অপরাধীর নিজের দেহের আঘাত থেকে রক্তপাত হবার সময় নানাভাবে ঐ রক্ত অপরাধীর হাতে লেগে যেতে পারে। রক্তাক্ত হাত বিভিন্ন জায়গায় রাখার সময় অপরাধীর হাতের ছাপ ঐ জায়গাগুলোতে পড়ে থাকে। রক্ত খুবই অল্প সময়ের মধ্যে শুকিয়ে যায় ও অপরাধীর হাতের ছাপটি ওর মধ্যে ধরা পড়ে থাকে। এ ধরনের হাতের ছাপ সাধারণতঃ বেশ স্পষ্ট হলেও এগুলোকে অনুসন্ধানের উপযোগী করে তুলতে হয়। এই উপযোগী করে তোলার জন্যে অধুনা অপরাধতত্ত্ববিদরা নিম্নলিখিত উপায়টি অবলম্বন করে থাকেন।—

"এক গ্রাম Leuco-mallachite green পঞ্চাশ গ্রাম ইথারের সঙ্গে মেশাতে হবে, তারপর ঐ মিশ্রণের সঙ্গে দশ ফোঁটা গ্লেসিয়াল-এ্যাসেটিক-এ্যাসিড মিশিয়ে নিতে হবে। এই ভাবে প্রস্তুত মিশ্র তরল পদার্থের কিছু অংশ একটি টেস্ট টিউবে নিয়ে তার সঙ্গে কয়েক ফোঁটা হাইড্রোজেন পারোক্সাইড (২৫%—৩০%) মিশিয়ে দিতে হবে। এইবার একটা পিপেটের (রাসায়নিক পরীক্ষাগারে ব্যবহার্য্য সরু কাঁচের নল) সাহায্যে ঐ মিশ্র পদার্থ খানিকটা নিয়ে অস্পষ্ট ছাপটির উপর যথারীতি ধীরে ধীরে ঢাল্‌তে হবে। এরপর—ঐ মিশ্র পদার্থটি যাতে ছাপটির উপর ভালভাবে ছড়িয়ে পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। রক্তমাখা ছাপটির উপর পিপেট থেকে তরল পদার্থটি যখন থেকে ঢালা হবে ঠিক তখন থেকেই সঙ্গে সঙ্গে ছাপটির উপর আস্তে আস্তে ফুঁ দিয়ে যেতে হবে। এই ভাবে ফুঁ দেওয়ার ফলে তরল পদার্থটি ছাপটিকে একটুও বিকৃত না করে খুব তাড়াতাড়ি উবে যাবে। উবে যাওয়ার ফলে ছাপটি নীল রঙের দেখাবে। এইবার ক্যামেরার সাহায্যে এর একটি ছবি তুলে নিতে হবে। নতুবা এই ছাপের সাহায্যে অন্য কোনো কাজ করা সম্ভব হবে না। মানুষের গায়ের চামড়ার ওপর রক্তাক্ত ছাপ পাওয়া গেলে সেটিকেও এইভাবে কার্যোপযোগী করে নেওয়া হয়ে থাকে।"
[crime Detection : Svensson and wendell]

নরম জিনিসের উপর যে ছাপ পাওয়া যায় সেগুলো সাধারণতঃ দীর্ঘস্থায়ী। যে জিনিসটির উপর ছাপ পড়েছে সেটি যতদিন ঠিক থাকবে ততদিন ছাপও অবিকৃত থাকবে। নরম কাদার উপর ছাপ অনেক বছর পরেও অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। হাতে কোনো জিনিস লেগে যাওয়ার ফলে যে ছাপ পড়ে সেগুলিও সহজে নষ্ট হয় না। যে সমস্ত ছাপ অস্পষ্ট সেগুলি যদি অন্য কোনো জিনিসের সংস্পর্শে না এসে পড়ে তাহলে বেশ কিছুদিন অবিকৃত অবস্থায় থাকে।

ঘটনাস্থলে এবং বিভিন্ন তদন্তের মাধ্যমে যে ছাপগুলি পাওয়া যায় সেগুলোকে ভবিষ্যতের কাজে লাগানোর জন্যে ক্যামেরার সাহায্যে চিত্র গ্রহণ নিরাপদ। কুশলী আলোক-চিত্রশিল্পীর সাহায্যে এই চিত্র গ্রহণ করা উচিত। কেন না, কোন্ জিনিসের উপর আলো কি ভাবে প্রতিফলিত হলে ছবি স্পষ্ট উঠ্বে অর্থাৎ অনুসন্ধানের উপযোগী ছবি উঠবে সেটির সম্বন্ধে চিত্র-গ্রাহকের বিশেষ জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। সাধারণতঃ এই কাজের জন্য পাশ্চাত্যদেশে Linhof Technica এবং Speed Graphic ক্যামেরা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্লাস্টারের ছাঁচ করেও ছাপগুলি সংরক্ষিত করা যায়। ১৮৯৯ সালে Finger Print Oil নামে একটি ছাপ সংরক্ষিত করবার মাধ্যম ডুবয়েস নামে ব্রেজিল দেশীয় জনৈক ভদ্রলোক আবিষ্কার করেছিলেন। এই মাধ্যমটির ব্যবহার পদ্ধতি সরল ও সহজেই শেখা যায়। বর্তমানে বিশেষ পদ্ধতিতে প্রস্তুত এক রকমের ফিতের সাহায্যে ছাপ সংরক্ষণ করা হচ্ছে। কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে ছাপের নষ্ট অংশ উদ্ধার করবার জন্যে বিশেষজ্ঞ শিল্পীর সাহায্য গ্রহণ করা হয়। হাতের বা আঙ্গুলের যে দাগগুলি ছাপে স্পষ্ট হয় সেগুলির সঙ্গে পায়ের আঙ্গুলের বা পাতার ছাপের হুবহু মিল পাওয়া যায়।

দস্তানার ছাপ ঃ

দস্তানা-পরা হাত ঢাকা থাকলেও দস্তানা-পরা হাতের ছাপ অপরাধীর অনুসন্ধানে আঙ্গুলের ছাপের মতোই প্রয়োজনীয়। দস্তানার এমন কতকগুলি চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য এসে পড়ে যাতে করে দস্তানার অধিকারী

সন্দেহভাজন হওয়ার পর অতি সহজেই তাকে অভিযুক্ত করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে। মসৃণ জায়গায় দস্তানার ছাপ সর্বাপেক্ষা ভাল পাওয়া যায়। দস্তানার পরিবর্তে, রুমাল, মোজা, সিল্কের কাপড় ইত্যাদির সাহায্যে অপরাধী আঙ্গুলের ছাপ বিকৃত করে থাকে। কয়েকটি ক্ষেত্রে এই জন্য ছাপটি অনুসন্ধানের কাজ নিষ্প্রয়োজন হয়ে যায়।

পায়ের ছাপ ঃ

অপরাধীর অনুসন্ধানে পায়ের ছাপ একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে থাকে। ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত পায়ের ছাপগুলি অনেক ক্ষেত্রেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে থাকে। গুরুতর ঘটনাগুলির ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত প্রতিটি পায়ের ছাপ বিনা দ্বিধায় সংরক্ষণ করে রাখা কর্তব্য। অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট (সন্দেহভাজন) ব্যক্তিদের পায়ের ছাপ অথবা জুতার ছাপের সহিত ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত ছাপগুলির তুলনামূলক বিচার থেকে অপরাধীকে আবিষ্কার করা সম্ভবপর হয়। খালি পায়ের ছাপে পায়ের সামনের দিকের ও পিছনের দিকের ছাপই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কারণ হাঁটবার সময় এই দুটো অংশেই চাপ বেশি পড়ে। দৌড়োবার সময় পায়ের যে ছাপ পড়ে তা অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট হলেও পায়ের ছাপগুলির মধ্যে ব্যক্তির দৌড়োবার একটি বিশেষ ভঙ্গী স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কোনো লোক দৌড়োবার সময় কেবল পায়ের পাতার সামনের দিকের উপর জোর দিয়ে দৌড়োয়। এ ছাড়া একটি পা থেকে অন্য পা ফেলার দূরত্বও বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক।

হাঁটা বা দৌড়োবার সময় পর পর যে পায়ের ছাপগুলি পড়ে থাকে সেগুলির মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য থাকে। ব্যক্তিবিশেষে এই ভঙ্গিমার মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কোনো লোকের হাঁটা বা দৌড়োবার সময় পদক্ষেপগুলির অবস্থিতির সংস্থান অপর ব্যক্তির সহিত সাধারণতঃ হুবহু এক রকমের হয় না। পাশ্চাত্যদেশীয় অপরাধতত্ত্ববিদরা এই পদক্ষেপ-চিত্রের নাম দিয়েছেন Gait Pattern (চলন ভঙ্গীর ধাঁচ বা রকম)।

অপরাধী অনেক সময় নিজের গতিবিধি রহস্যময় করে তোলবার

জন্যে পিছু হেঁটে চলে যায়, পদক্ষেপ-চিত্রের সাহায্যে তা-ও নির্ণয় করা সম্ভব। পদক্ষেপ-চিত্র অঙ্কন করবার সময় সঠিক মাপ ও বিচক্ষণ পর্যবেক্ষণ বিশেষ প্রয়োজনীয়। পায়ের ছাপগুলির চিত্র সংগ্রহ করবার সময় ছাপগুলির প্রতিটি বৈশিষ্ট্য যাতে ছবিতে আসে সেদিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে। জুতোর ছাপের মধ্যে জুতোর ক্ষয়ে-যাওয়া অংশ, ভাঙা অংশ, পেরেক, জুতো সারানোর দাগ ইত্যাদি চিহ্নগুলির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। এই গুলির প্রত্যেকটি তুলনামূলক অনুসন্ধানের সহায়ক।

অপরাধতত্ত্ববিদরা পদচিহ্নগুলিকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করে থাকেন। প্রথমতঃ, কাদা ইত্যাদি নরম কোনো জিনিসের ওপর পা ফেলায় তার ওপর যে ছাপ পড়ে সেগুলিকে বলা হয় Foot Impression (পায়ের ছাপ)। দ্বিতীয়তঃ, পায়ের পাতায় কোনো জিনিস লেগে থাকার জন্য (ধুলো, কাদা, রক্ত, তৈলাক্ত পদার্থ ইত্যাদি) কোনো শুকনো শক্ত জায়গায় পা ফেলার সময় যে ছাপ পড়ে সেগুলিকে বলা হয় Foot Print (পায়ের চিহ্ন)। Foot Impression ও Foot Print-এর মধ্যে লক্ষণীয় বস্তু—এদের কতকগুলি চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য।

ঘটনাস্থলে পর্যবেক্ষণের সময় পায়ের ছাপগুলির সন্ধান পাওয়ার পর এই ছাপগুলির যথাযথসংরক্ষণ প্রয়োজন। কারণ প্রাপ্ত ছাপগুলির অটুট সংরক্ষণ না হলে এর থেকে ভালভাবে ছাঁচ নেওয়া সম্ভব হবে না। সর্বপ্রথম ছাপগুলির ওপর ঢাকনা বা ঐ জাতীয় কোনো জিনিস দিয়ে ঢেকে রাখা কর্তব্য। যতক্ষণ পর্যন্ত ছাঁচ নেওয়ার জন্য বিশেষজ্ঞ না আসেন ততক্ষণ এই ভাবে ঢাকা দিয়ে রাখা সমীচীন। সাধারণতঃ ক্যামেরার সাহায্যে চিত্রগ্রহণ করে অথবা ছাঁচ নিয়ে এই ছাপগুলিকে সংরক্ষিত করা হয়। ছাঁচ নেওয়ার মাধ্যম হিসাবে প্যারিস প্লাস্টার, মোম ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। চিত্র গ্রহণ করবার অথবা ছাঁচ নেবার আগে ছাপটিকে সূক্ষ্ম কোনো ফলক যন্ত্রের (সূক্ষ্ম সাঁড়াশি বা সন্নার) সাহায্যে বা বায়ু প্রবাহক যন্ত্রের সাহায্যে অতি সন্তর্পণে পরিষ্কার করে নেওয়া প্রয়োজন। কারণ পায়ের ছাপের উপর ধুলো, ঘাস, পাতা

অথবা অন্য কোনো জিনিসের টুকরো পড়ে থাকার ফলে ছাপটির চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য আক্রান্ত হয়। সুতরাং ছাঁচ বা ছবির মধ্যেও এই দোষ থেকে যাওয়ায় ভবিষ্যতে অনুসন্ধানীকে অসুবিধায় পড়তে হয়।

অপরাধের সময় ব্যবহৃত যন্ত্রাদি :

জিনিসপত্র অর্থাৎ সিন্দুক, আলমারি, দরজা, জানালা, ইত্যাদি ভাঙ্গবার জন্যে অপরাধী বিভিন্ন যন্ত্রাদির সাহায্য নিয়ে থাকে। ঘটনা-স্থলে ভাঙ্গা আসবাবপত্রের মধ্যে অপরাধী কর্তৃক ব্যবহৃত যন্ত্রাদির বিবিধ চিহ্ন পাওয়া যায়। এই চিহ্নগুলিকে অপরাধতত্ত্ববিদগণ সাধারণতঃ দুটি শ্রেণীতে ভাগ করে থাকেন। প্রথম শ্রেণীর চিহ্নগুলি থেকে ব্যবহৃত যন্ত্র বা হাতিয়ারগুলির আকৃতি সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর চিহ্নগুলি থেকে যন্ত্রপাতি নিয়ে অপরাধীর কার্যপ্রণালীগত ও যন্ত্রপাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। যন্ত্রগুলির আকৃতি সম্বন্ধে জানবার পর, অপরাধী সন্দেহে ধৃত ব্যক্তির নিকটে প্রাপ্ত যন্ত্রপাতিগুলির সঙ্গে ঐগুলির কোনো রকম সাদৃশ্য আছে কি না অনুসন্ধান করা সম্ভবপর। তবে অনেক ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির একই ধরনের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য অথবা কার্যপ্রণালীর একই ধরনের বৈশিষ্ট্য অপরাধী-সন্ধান কার্যে একটি প্রয়োজনীয় ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। সুতরাং ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত যন্ত্রাদির চিহ্নগুলির চিত্র অথবা ছাঁচ গ্রহণ করে রাখা সর্বতোভাবে অনুসন্ধানের কাজে সহায়ক।

অপরাধীর দেহজ বিভিন্ন চিহ্ন :

(রক্ত)

অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জামা কাপড় ইত্যাদিতে এবং ঘটনাস্থলে রক্তের চিহ্ন পাওয়া যায়। তদন্তকারীর অনুসন্ধানের কাজে এই রক্তচিহ্ন বিশেষ উপযোগী। অপরাধের রহস্য উদ্ঘাটনের ব্যাপারে যাঁরা নিযুক্ত আছেন, মানুষের রক্ত সম্পর্কে তাঁদের বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

আমাদের রক্তের মধ্যে রক্তরস ও রক্ত কণিকা বর্তমান। সাধারণতঃ দেহের ওজনের $\frac{1}{13}$ ভাগ রক্ত শরীরে থাকে। সুস্থ ব্যক্তির দেহের সমগ্র

রক্তের পরিমাণ প্রায় নয় পাঁইট। রক্ত কণিকাগুলির মধ্যে লোহিত বর্ণের কণিকা থাকায় রক্ত লাল দেখায়। রক্তের মধ্যে ফাইব্রিনোজেন নামক এক প্রকার পদার্থের অবস্থিতি রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়ার জন্য দায়ী। রক্ত জমে যাওয়ার পর জমাট-বাঁধা রক্ত দুই অংশে ভাগ হয়ে যায়—জমাট-বাঁধা রক্তের পিণ্ডের মধ্যে থাকে লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা, ও ফাইব্রিন বা পরিবর্তিত ফাইব্রিনোজেন; আর রক্তের পিণ্ডের চারপাশে ছড়িয়ে থাকে ঈষৎ হলুদ রঙের রক্তরস যার মধ্যে রক্তের অন্যান্য পদার্থগুলি থাকে।

ঘটনাস্থলে অথবা ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জামা কাপড়ে রক্তের মত দাগ পাওয়া গেলে, প্রথমেই পরীক্ষার দ্বারা নিশ্চিত হতে হবে যে সেটি রক্ত কি না। এই ধরনের পরীক্ষা কার্য অনুবীক্ষণ যন্ত্র, বর্ণালী বিশ্লেষক যন্ত্র অথবা অণুরাসায়নিক পদ্ধতির মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। রক্তের কতকগুলি চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য এই পরীক্ষায় ধরা পড়ে বলে কোনো লাল দাগকে রক্ত বলে ভুল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। রক্তচিহ্ন নির্ভুল প্রতিপন্ন হওয়ার পর প্রধান কর্তব্য হচ্ছে যে, ঐ রক্ত মানুষের অথবা অন্য কোন প্রাণীর কিনা পরীক্ষার দ্বারা সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া। রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা নররক্ত বা অন্য প্রাণীর রক্ত প্রমাণ করা সহজ সাধ্য। কোনো স্থানে মানবেতর প্রাণীর রক্ত পাওয়া গেলে সেটা কোন প্রাণীর তা নির্ণয় করা কর্তব্য।

কোনো কোনো ঘটনাস্থলে অনেক লোকের দেহের রক্ত এক সঙ্গে পাওয়া যায়। বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন শ্রেণীর (Group) রক্ত পাওয়া যায়। সুতরাং পরীক্ষার দ্বারা ঘটনাস্থলে কতগুলি লোকের দেহের রক্তপাত হয়েছে তাও নির্ণয় করা সম্ভব। খুন, জখম, পাশবিক অত্যাচার ইত্যাদি অপরাধে এই ধরনের পরীক্ষা কার্যকরী। দেহের বিভিন্নস্থানের ক্ষতের রক্ত বিভিন্ন বিশিষ্টতার নির্দেশ দেয়। যেমন, নাকের রক্তে নাকের ভিতরকার ক্লেদ, শ্লেষ্মা ইত্যাদি; রক্তস্রাবে এক প্রকার কোষের (Epithelial cell) অবস্থিতি; যৌনাঙ্গের ক্ষতে রক্তের সঙ্গে যৌন-কেশের অবস্থিতি ইত্যাদি স্থানীয় চরিত্রের বিশেষত্ব নির্দেশ করে।

রক্তের দাগটি টাটকা অথবা বহুদিনের তাও পরীক্ষার দ্বারা ঠিক করা সম্ভব। অনুসন্ধানীয় প্রত্যেকটি পরীক্ষাই অনুসন্ধানের কাজে সহায়ক।

বিভিন্ন উচ্চতা থেকে লম্ব ভাবে রক্ত মাটিতে পড়ার ফলে রক্তের ফোঁটাটির মধ্যে আকৃতিগত কতকগুলি বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়। রক্তপাতের বেগ, তির্যকভাবে রক্তপাত ইত্যাদি বিভিন্ন অবস্থা রক্তের ফোঁটাটির আকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করে।

রক্তের ফোঁটার বিভিন্ন বিশেষত্ব থেকে—রক্ত কোথা থেকে পড়েছে, খুন বা জখম কোন জায়গায় ঘটেছে, আহত বা নিহত ব্যক্তি কোথায় ও কি ভাবে আক্রান্ত হয়েছে, আঘাত বা আক্রমণ কোন দিক থেকে হয়েছে ইত্যাদি বহু প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। রক্তাক্ত অস্ত্র নিয়ে দৌড়ানোর সময় অথবা রক্তাক্ত হাত নিয়ে ঘোরাঘুরি করার সময় রক্ত বিভিন্নভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হতে পারে। এই বিক্ষেপের মধ্যেও বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। এইগুলির প্রত্যেকটি অনুসন্ধান কার্যের সহায়ক।

সুতরাং রক্তের দাগযুক্ত প্রতিটি বস্তুর সংরক্ষণ অনুসন্ধানীর অন্যতম কর্তব্য। এ ছাড়া যেখানে টাটকা রক্ত (অর্থাৎ জমে যায়নি এ রকম অবস্থায়) পাওয়া যাবে সেটা তৎক্ষণাৎ টেস্ট টিউবের মধ্যে সযত্নে তুলে রাখতে হবে। জামা, কাপড়, ইত্যাদিতে রক্তের দাগ পাওয়া গেলে ঐ জিনিসগুলির অবিকৃত সংরক্ষণের দিকে নজর রাখতে হবে।

(দেহজ রস এবং ক্লেদাদি)

খুন, বলাৎকার, অপহরণ ইত্যাদি কয়েকটি বিশেষ ধরনের অপরাধের অনুসন্ধানে দেহজ বিভিন্ন রস ও ক্লেদ অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্ধান দেয়। বিভিন্ন ব্যক্তির দেহে যেমন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর রক্ত বর্তমান থাকে সেইরকম বিভিন্ন ব্যক্তির দেহজ রস ও ক্লেদাদিতে বিভিন্ন মাত্রার জৈব ও অজৈব পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায়। ঘটনাস্থলে অথবা সন্দেহ-ভাজন ব্যক্তির দেহে উক্ত বিষয়গুলির অস্তিত্ব পাওয়া স্বাভাবিক। তদন্তের সুবিধার জন্য এইগুলি অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে সংরক্ষণ করে পরীক্ষাগারে পাঠানো উচিত। রক্ত, মল, মূত্র, থুতু, বমি, যৌনগ্রন্থিরস,

ইত্যাদির কোনোটিকেই অপরাধ অনুসন্ধানের কাজে অবহেলা করা উচিত নয়। অনুসন্ধানকারীদের অন্যান্য তথ্যগুলির অনুসন্ধানের সময় এইগুলির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। কয়েকটি ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির দেহে প্রাপ্ত উপরোক্ত তথ্যগুলির সাহায্যে অপরাধীর সন্ধান পাওয়া সহজসাধ্য হয়ে থাকে। সন্দেহভাজন ব্যক্তির গৃহে এবং ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত অস্ত্রশস্ত্রাদির বিভিন্ন অংশে উপরোক্ত তথ্যগুলির সন্ধান পাওয়া যায়। সুতরাং অস্ত্রাদির পরীক্ষার সময়ে এই বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

(কেশ)

বিভিন্ন প্রাণীর দেহে বিভিন্ন ধরনের কেশ পাওয়া যায়। মানুষের দেহের কেশের কতকগুলি চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য বর্তমান। মানবদেহে বিভিন্ন অঙ্গের কেশের গঠন বা আকৃতিও ভিন্ন। আকৃতির প্রভেদ ছাড়া কেশ-গাত্রের দেহজ রস ও ক্লেদাদি দেহের বিভিন্ন অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য বহন করে। অস্ত্রাদির গায়ে অনেক সময়ে কেশের অস্তিত্ব পাওয়া যায়; সুতরাং কেশের সন্ধান পাওয়া গেলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির অনুসন্ধান করা বিশেষ প্রয়োজন। উহা মানব অথবা মানবেতর প্রাণীর এবং উহা কোন শ্রেণীর প্রাণীর; উহা দেহের কোন অংশের; উহা স্ত্রী বা পুরুষ দেহের; প্রাপ্ত কেশগুলি একটি দেহের অথবা বহু দেহের; কেশের (যদি মানুষের হয়) আকৃতি ও প্রকৃতিগত পরিবর্তন থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বয়স কত হওয়া উচিত, ইত্যাদি।

(নানাবিধ তথ্য)

ঘটনাস্থলের ধূলা, বালি ইত্যাদি কোনোমতেই অবহেলা করা উচিত নয়। অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জামাকাপড়ের মধ্যে যে সমস্ত ধূলাবালি পাওয়া যায় সেগুলিকে অতি সন্তর্পণে ধূলা-সংগ্রাহক যন্ত্রের সাহায্যে সংগ্রহ করা উচিত। ঘটনাস্থলের ধূলাবালির সঙ্গে জামাকাপড়ের ধূলা কখনো মিশিয়ে ফেলা উচিত নয়। কারণ বিভিন্ন পেশা, বিভিন্ন অঞ্চল, বিভিন্ন জীবনযাত্রা প্রণালীর বিষয়ে পরিহিত বস্ত্রাদির ও জুতার তলার ধূলা ইঙ্গিত দেয়।

সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের জামাকাপড় পরীক্ষার সময় ধূলা, বালি ছাড়া রঙের দাগ, মরচে, ধাতুর গুঁড়ো, কাঁচের গুঁড়ো, খাদ্যদ্রব্যের অংশ প্রভৃতির অনুসন্ধান করা কর্তব্য। এইগুলির প্রত্যেকটিই দুষ্কৃতকারী অনুসন্ধানের সহায়ক।

সিগ্রেটের বা চুরুটের টুকরো, তামাকের অবশিষ্ট অংশ, দেশলাইয়ের কাঠি ও বাক্স, দড়ির আঁশ, লেখবার কাগজের টুকরো, ইত্যাদির প্রত্যেকটিকেই অপরাধতত্ত্ববিদগণ প্রয়োজনীয় তথ্য বলে মনে করেন। সুতরাং এগুলির কোনোটিকে অবহেলা করা উচিত নয়। এমন কি পুড়িয়ে ফেলা কাগজের টুকরাও সযত্নে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

ঘটনাস্থলে জানালা, দরজা ও সার্সির কাঁচ কি ভাবে ভেঙেছে সেটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত। এইগুলি ভিতর দিক থেকে বা বাইরের দিক থেকে ভাঙা হয়েছে সেটি সর্বাগ্রে অনুসন্ধান করতে হবে। কতদূর থেকে এবং কিভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে কাঁচটি ভেঙেছে তা জানা বিশেষ প্রয়োজন। কতকগুলি কাঁচ সহজে ভাঙ্গে না, এমন কি বুলেটের আঘাতও সহ্য করে। এই কাঁচের মধ্যে যে দাগগুলি পড়ে তার চিত্র গ্রহণ ও সংরক্ষণ করা নিশ্চিত প্রয়োজন ; বিশেষজ্ঞেরা এইগুলি থেকে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্ধান পেয়ে থাকেন।

(মোটর গাড়ী)

মোটর গাড়ীর সহায়তায় বহু প্রকারের অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে। এই গাড়ীগুলি সাধারণতঃ চুরি করে নিয়ে যাওয়া গাড়ী। অপরাধীরা অপরাধ কার্য সমাধা করে গাড়ীখানি কোনো স্থানে পরিত্যাগ করে পালিয়ে যায়। এই ধরনের পরিত্যক্ত গাড়ীগুলির মধ্যে বহু প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এতক্ষণ যে সমস্ত তথ্যগুলির বিষয় আলোচনা করা হলো সেগুলির প্রায় প্রত্যেকটিই পরিত্যক্ত গাড়ী-গুলির মধ্যে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং গাড়ীগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে অনুসন্ধান করা কর্তব্য।

দুর্ঘটনায় সংশ্লিষ্ট গাড়ীগুলির চিহ্নগুলি থেকে দুর্ঘটনার তদন্ত করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয়। অনেক সময় চাপা দেওয়ার পর অথবা

অপর কোনো গাড়ীকে ধাক্কা দেওয়ার পর দোষী ব্যক্তি গাড়ী সহ পলায়ন করে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে ঘটনাস্থলে কিছু তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। পলাতক গাড়ীটির নম্বর পাওয়া না গেলে ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত তথ্যাদির উপর নির্ভর করে অনুসন্ধান চালাতে হয়। পরিত্যক্ত কোনো গাড়ীর উপর কোনো অনুসন্ধান করার পূর্বে গাড়ীটিকে কোনো গরম জায়গায় রেখে ভালভাবে শুকনো করে নেওয়া উচিত। কারণ বাইরে পড়ে থাকার সময় গাড়ীর ভেতর একটা স্যাঁতসেঁতে ভাবের স্থষ্টি হয় এবং এটি অনুসন্ধান কার্যের প্রতিকূল। পরিত্যক্ত কোনো গাড়ী সন্দেহজনক মনে হলে কোনো ক্রমেই তাকে চালানো উচিত নয়। অনেক সময় ঐ ধরনের গাড়ী নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্যে অনুসন্ধানের পূর্বেই চালানো হয়ে থাকে। এই ধরনের কোনো প্রচেষ্টা অপরাধ অনুসন্ধানের প্রতিকূল। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করা শেষ না হওয়া পর্যন্ত গাড়ীটি যে অবস্থায় পাওয়া যাবে সেই অবস্থাতেই রেখে দেওয়া উচিত।

(মোটর দুর্ঘটনা)

মোটর চাপা পড়া প্রায় একটা দৈনন্দিন ঘটনা। সাধারণতঃ চাপা দেওয়ার পর আহত বা নিহত বলে সন্দেহ ব্যক্তিকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে চালক গাড়ী নিয়ে পালিয়ে যান। কোনো কোনো ক্ষেত্রে চালক নিজেকে আইনের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে গাড়ী চালান যে পালাবার সময় অন্যান্য বিপর্যয় ও দুর্ঘটনার স্থষ্টি হয়ে থাকে। ঘটনাস্থলে গাড়ীটি ধরা না পড়লে অথবা গাড়ীর কোনো রকম সন্ধান না পাওয়া গেলে গাড়ীটির অনুসন্ধান খুবই কষ্টকর হয়ে ওঠে। বর্তমানে অপরাধ বিজ্ঞানীরা গাড়ীর গায়ে আঘাতের চিহ্ন এবং ঘটনার বিবরণ এই দুইয়ের সাহায্যে ঘটনার আনুমানিক চিত্র অঙ্কন করে এই সমস্ত ক্ষেত্রে গাড়ীটির সন্ধান করে থাকেন। যে সমস্ত কারখানায় মোটর গাড়ীর সংস্কার করা হয়ে থাকে সাধারণতঃ ঐগুলিকে বলা হয় 'গ্যারেজ'। অপরাধ অনুসন্ধান বিভাগের কর্মচারীরা ঐ গ্যারেজগুলিতে অনুসন্ধান চালিয়ে থাকেন।

দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরা যাক যে একটি মোটর গাড়ী কোনো সাইকেল আরোহীকে চাপা দিয়েছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে আরোহীটি সাইকেল চড়ে রাস্তার বাঁ দিক ধরে যাচ্ছিল এমন সময় মোটর গাড়ীটি পেছন থেকে ধাক্কা মারে। ধাক্কা এত জোর হয়েছিল যে সাইকেলটির পিছন দিক একেবারে তুবড়ে যায় ও আরোহীটি সাইকেল থেকে পড়ে যায়। গাড়ীর চালক কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পালিয়ে যাবার সময় সাইকেলের আরোহীটির উপর দিয়ে চলে যাওয়ার ফলে তার মৃত্যু ঘটে। পলাতক গাড়ীটির চালককে স্থানীয় দু একজন লোক দেখেছিল কিন্তু গাড়ীটির নম্বর কেউ নিয়ে রাখেনি। এইটুকু তথ্যের উপর নির্ভর করে অনুসন্ধান শুরু হলো। ঘটনাস্থলে দুটি জিনিস পাওয়া গেল—একটি হলো নিহত আরোহীর দেহ ও অপরটি হলো ধাক্কালাগা সাইকেল। ঘটনাস্থলে অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়েছিল যে সাইকেলটিকে পিছন দিক থেকে ধাক্কা দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং ভাঙা সাইকেল থেকে অনুসন্ধান বিভাগের কর্মচারীরা অনুমান করলেন কি ভাবে ধাক্কা লেগেছিল। সেই অনুযায়ী মোটর গাড়ীটির কোন কোন জায়গায় ধাক্কা লাগার চিহ্ন পাওয়া যেতে পারে তাঁরা অনুমান করে নিলেন। এরপর তাঁরা বিভিন্ন 'গ্যারেজে' অনুসন্ধান করতে লাগলেন। অবশেষে একটি গাড়ীর সন্ধান পাওয়া গেল। এইবার সেই গাড়ীটির সামনে ভাঙা সাইকেলটি রেখে দুর্ঘটনার অবস্থাটি সৃষ্টি করলেন। ফলে ধরা পড়লো যে এই মোটর গাড়ীটি সাইকেলটাকে ধাক্কা দিয়েছে। এর পর গাড়ীর চালক দোষ স্বীকার করলেন।

(মোটর গাড়ীর চাকার দাগ)

ভারবাহী লরির চাকার দাগ ভালভাবে অনুসন্ধান করলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধরতে পারা যায় যে গাড়ীটিতে কি ধরনের মাল ছিল। কারণ বয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় চাকার কোনো অংশে মালের কোনো অংশ বা টুকরো-টাকরা লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। গাড়ীর চাকার দাগ গাড়ীটি কোনদিকে গেছে সেটি বলে দিতে বিশেষ সাহায্য করে। রাস্তায় কাদা বা জল থাকলে চাকার দাগের পাশে আর একটি

সরু ছিটকানো কাদার দাগ পাওয়া যায়। গাড়ী একেবারে সোজা চললে কেবল মাত্র পিছনের চাকার দাগটি পাওয়া যায়। এই সমস্ত ক্ষেত্রে কোনো বাঁকের মুখ ছাড়া গাড়ীর সামনের চাকার দাগ পাওয়া সম্ভব হয় না। নতুন টায়ার, পুরোনো টায়ার, বিভিন্ন কোম্পানীর তৈরি টায়ার ইত্যাদি প্রত্যেকের ছাপের মধ্যে বৈশিষ্ট্য থাকে। সুতরাং প্রতি ক্ষেত্রে চাকার দাগের ছাঁচ অতি সাবধানে গ্রহণ করা উচিত।

(মৃত্যু হলো কেন ?)

কোনো মৃতদেহের সন্ধান পাবার পর মৃত্যু কি কারণে ঘটেছে তা জানবার আগ্রহ স্বাভাবিক। রহস্যজনক মৃত্যুর কারণ খুঁজে বার করা অপরাধ অনুসন্ধানীদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। অপরাধ-বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে সব সময়েই এই ব্যাপারে কোনো অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করা উচিত। কারণ মৃত্যু কি কারণে ঘটেছে সেটা সাধারণের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। অপরাধতত্ত্বে অভিজ্ঞ কোনো চিকিৎসককে ঘটনাস্থলে নিয়ে আসা অনুসন্ধান বিভাগীয় কর্মীদের প্রথম কর্তব্য। চিকিৎসক ছাড়া যে সমস্ত কর্মী ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকবেন তাঁদের কতকগুলি বিষয় ঐ সময় জ্ঞাত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। যেমন,—মৃত্যু কি ভাবে হয়েছে, মৃত্যুর জন্য লোকটি নিজে দায়ী, না অপর কেউ দায়ী, নিছক দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যু হয়েছে কি না ইত্যাদি।

অনেক ক্ষেত্রে ঘটনাস্থল অনুসন্ধানের সময় আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে মৃত্যুর কারণ দুর্ঘটনা। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে অনুসন্ধানের কাজ সম্পূর্ণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঐ রকম কোনো সিদ্ধান্ত করা সমীচীন নয়। বরং মৃত্যুর জন্যে কোনো অজ্ঞাত লোকই দায়ী এই ধারণা নিয়ে হত্যাকারীর সন্ধানের জন্যে সতর্ক অনুসন্ধান চালানো উচিত। কতকগুলি ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে হত্যাকাণ্ডের পর চতুর হত্যাকারী ঘটনাস্থলে বিভিন্ন তথ্য এমন ভাবে সাজিয়ে রেখে যায় যাতে ভাল ভাবে সন্ধান না করলে হত্যাকে আত্মহত্যা বলে মনে হতে পারে। হত্যাকারীর পক্ষে আত্মরক্ষার জন্যে বহুবিধ ছল চাতুরীর আশ্রয় নেওয়া স্বাভাবিক ; সুতরাং তদন্তকারীদের সব সময়েই সতর্ক পদক্ষেপে চলতে হবে।

মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করবার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সম্বন্ধে নিখুঁত ভাবে সন্ধান করতে হবে ঃ—

(১) মৃত ব্যক্তির মৃত্যু স্বাভাবিকভাবে হয়েছে, না অস্বাভাবিক-ভাবে ঘটেছে।

(২) মৃত ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে, না সে আত্মহত্যা করেছে।

(৩) কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে কি না।

(৪) নিহত ব্যক্তির দেহে কোনো আঘাতের চিহ্ন থাকলে—সেটা কি ভাবে হয়েছে, লোকটির নিজের দোষে হয়েছে অথবা অপর কেউ আঘাত করেছে।

(৫) নিহত ব্যক্তির দেহে কোনো ধস্তাধস্তির চিহ্ন আছে কি না।

(৬) যদি লোকটিকে হত্যা করা হয়ে থাকে তাহলে কি ধরনের অস্ত্রের সাহায্যে তাকে হত্যা করা হয়েছে।

মৃতদেহের আশেপাশে ধস্তাধস্তির চিহ্ন বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করা উচিত। যে স্থানে ধস্তাধস্তি হয়েছে সেখানে রক্তের দাগ, মাথার চুল অথবা গায়ের লোম, ভাঙা আসবাবপত্র, ছেঁড়া কাপড়জামা ও বিছানার অংশ, অস্ত্রশস্ত্রের দাগ, আততায়ীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার সময়ে মৃত ব্যক্তির দেহের উপর বিভিন্ন আঘাত, প্রভৃতির সংরক্ষণ বিশেষভাবে কর্তব্য। উপরিউক্ত প্রতিটি জিনিসের সংস্থানের উপর ভবিষ্যতের অনুসন্ধান বিশেষভাবে নির্ভরশীল। সংরক্ষণ ব্যতীত প্রতিটি বস্তুর অবস্থানের আলোক চিত্র গ্রহণ করাও উচিত।

ঘটনাস্থলের দরজা, জানালা, সিঁড়ি, প্রবেশ পথ, বাড়ীর চিঠির বাক্স, চিঠিপত্র, বাড়ীর প্রতিটি ঘর ও প্রতিটি আসবাবপত্রের উপর সন্ধানী দৃষ্টির সাহায্যে হত্যাজনিত চিহ্নের অনুসন্ধান অবশ্য করণীয়।

হত্যা, আত্মহত্যা এবং যে কোনো সন্দেহজনক মৃত্যুর পর মৃতদেহ পর্যবেক্ষণ করে কতক্ষণ আগে মৃত্যু ঘটেছে তার সন্ধান করা উচিত। মৃতদেহের শীতলতা, অনমনীয়তা, পচনজনিত চিহ্ন, চক্ষুর তৎকালীন অবস্থা ইত্যাদির সাহায্যে মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর বা নিহত হওয়ার আনুমানিক সময় নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

হত্যার সময়ে আততায়ী ভোঁতা অথবা ধারাল অস্ত্র ব্যবহার করে থাকতে পারে। ভোঁতা অস্ত্রের দ্বারা আঘাতের কতকগুলি চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমেই লক্ষ্য করতে হবে যে অস্ত্রটি সোজাভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল কি না। যদি সোজাভাবে প্রয়োগ না করা হয়ে থাকে অর্থাৎ যদি বাঁকা ভাবে করা হয়ে থাকে তখন লক্ষ্য করতে হবে যে অস্ত্রটি নিকট থেকে প্রয়োগ করা হয়েছিল, না দূর থেকে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। ঘষে যাওয়া, ছড়ে যাওয়া, থেঁতলে যাওয়া, গর্ত হয়ে যাওয়া, ভেতরের হাড় গুঁড়িয়ে যাওয়া, ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলি ভোঁতা অস্ত্রের বা অস্ত্রের অশানিত দিক দিয়ে আঘাতের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য।

ধারাল অস্ত্রের আঘাতের কতকগুলি চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য আছে। ক্ষতের আকৃতি, রক্তবাহী নলের বিকৃতি, ক্ষতের গভীরতা ইত্যাদির সাহায্যে তা স্থির করতে হয়। ধারাল অস্ত্রের সাহায্যে আত্মহত্যাকারীদের দেহে সাধারণতঃ ধমনী বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখা যায়। গলা, হাতের কবজি, পায়ের বুড়ো আঙ্গুল সাধারণতঃ আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে কাটা হয়ে থাকে। আত্মঘাতী ব্যক্তির দেহে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একাধিক ক্ষত দৃষ্ট হয়। রক্তক্ষয়জনিত মৃত্যুর জন্য গভীর ক্ষতের বা আঘাতের প্রয়োজন। আত্মঘাতীর স্বীয় দেহের উপর আঘাত জনিত ভয়, রক্তবাহী নলের সংস্থান সম্বন্ধীয় অজ্ঞতা, প্রধানতঃ একাধিক আঘাতের জন্য দায়ী। অনেক সময় হত্যাকারী বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবার জন্যে অনুরূপভাবে আঘাত করে যাতে আপাতদৃষ্টিতে সে মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলে মনে করা হয়। এই সমস্ত সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে বিচক্ষণ অপরাধ-বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অভিমত গ্রহণ করা প্রয়োজন। আত্মঘাতীর আঘাতস্থল এবং তার আঘাতকারী হাতের অবস্থিতির মধ্যে স্পষ্ট সম্বন্ধ থাকে। অনেক ক্ষেত্রে আত্মঘাতী বুকে ছুরি ঢুকিয়ে আত্মহত্যা করে। আবার অনুরূপভাবে হত্যাকারীও হত্যা করে থাকে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে অনুসন্ধান করা উচিত। অনেক সময় নিহত ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ বিকৃত করবার জন্যে হত্যাকারী একই স্থানে বহুবার আঘাত করে—এই ক্ষেত্রে ধস্তাধস্তির চিহ্নগুলি বিশেষভাবে অনুসন্ধান

করা কর্তব্য। আত্মরক্ষা করবার জন্য এই সমস্ত ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির দেহে বহু চরিত্রের ক্ষতের সমাবেশ দেখা যায়।

বন্দুক, রিভলবার, বোমা ইত্যাদি জনিত মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানের সময় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। কারণ আত্মহত্যা এবং হত্যা—উভয়ই ঐগুলির সাহায্যে সংঘটিত হতে পারে। কোন দিক থেকে গুলি প্রবেশ করেছে, কিভাবে প্রবেশ করেছে, শরীরের কোন স্থান দিয়ে প্রবেশ করেছে, এই তথ্যগুলির সঙ্গে মৃতদেহের অবস্থান, বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সংস্থান এবং মৃতদেহের বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন বিশেষ সন্ধানী দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলে মৃত্যু কি উপায়ে ঘটেছে তা স্থির করা সম্ভব। সব সময়েই মনে রাখতে হবে যে, অপরাধ অনুসন্ধানের কাজে নির্ভুল অনুসন্ধান ও বিচক্ষণ বীক্ষণ-শক্তির প্রয়োজন।

শ্বাসরোধজনিত মৃত্যু নানা কারণে ঘটতে পারে। গলায় দড়ি দেওয়া, গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যা করা, নাকে ও মুখে কাপড় বেঁধে হত্যা করা, গলায় কোনো ভারী জিনিস বা রড দিয়ে হত্যা করা, জলে ডুবে নিঃশ্বাস না নিতে পারার জন্যে মৃত্যু হওয়া ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রেও আগের মতোই অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে তথ্য অনুসন্ধান করতে হবে। কিসের সাহায্যে ফাঁস লাগানো হয়েছে, কিভাবে ফাঁস লাগানো হয়েছে এবং ঐ ভাবে ফাঁস লাগানো মৃত ব্যক্তির নিজের পক্ষে সম্ভবপর কি না, বিশেষভাবে লক্ষ্য করা কর্তব্য। অনেক ক্ষেত্রে গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যা করার পর হত্যাকারী মৃতদেহকে গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দেয়। যাতে আপাতদৃষ্টিতে এটা আত্মহত্যা বলে মনে হয়। এ ক্ষেত্রে গলার প্রতিটি চিহ্ন বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়।

জলে ডুবে যাওয়ার জন্যে শ্বাসরোধ হলে শ্বাসনলী ও ফুসফুসের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ চিহ্ন পাওয়া যায়। শব-ব্যবচ্ছেদ দ্বারা এগুলির অনুসন্ধান সম্ভব। জলে ডুবিয়ে হত্যা করা হলে আত্মরক্ষার চিহ্ন হিসেবে মৃত ব্যক্তির মাথায় মুখে হাতে নানা ধরনের ক্ষতের সন্ধান পাওয়া যায়। জলে ডুবে আত্মঘাতী ব্যক্তির মাথায় বা মুখে ঝাঁপ

দেওয়ার সময়কার আঘাতের চিহ্ন সচরাচর পাওয়া যায়। অনেক সময় হত্যা করার পর পাথর বেঁধে নিহত ব্যক্তিকে জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে—এই ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির শ্বাসনলী ও ফুসফুসে শ্বাসরোধজনিত বিশেষ চিহ্নগুলির অস্তিত্ব না পাওয়া স্বাভাবিক। নিহত ব্যক্তির দেহ জলে ভেসে যাওয়ার সময় নৌকা, স্টিমার, লঞ্চ, পাথর ইত্যাদির সঙ্গে ঘর্ষণ লাগতে পারে অথবা কোনো জন্তুর কবলে পড়তে পারে। এই সব ক্ষেত্রে প্রতিটি চিহ্ন অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে নির্ধারণ করা উচিত।

কার্বন মনোক্সাইড নামক এক প্রকার বর্ণহীন বিষাক্ত গ্যাস অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যুর জন্যে দায়ী হয়ে থাকে। সাধারণতঃ এই গ্যাসের সাহায্যে আত্মহত্যা করা হয়। এই ধরনের বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাবে মৃত্যু ঘটলে শব ব্যবচ্ছেদের পর রাসায়নিক পরীক্ষার ফলাফলের সাহায্যে সিদ্ধান্ত করাই উচিত। অনেক সময় গ্যাসের পাইপ ছেঁদা হয়ে যাওয়ার ফলে নিছক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হতে পারে। তথ্য অনুসন্ধানের সময় গ্যাসের গন্ধ, ঘরের দরজা, জানালার অবস্থা, গ্যাসের পাইপের অবস্থা ইত্যাদি বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য।

(পাশবিক অত্যাচার ও যৌন অপরাধ জনিত হত্যা)

সাধারণতঃ পাশবিক অত্যাচার করার পর ধর্ষিতাকে হত্যা করা হয়ে থাকে, অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যৌন অপরাধী হত্যার মাধ্যমে নিষ্ঠুর আনন্দ উপভোগের ইচ্ছায় হত্যা করতে পারে—এই ক্ষেত্রে মৃতদেহে বহু আঘাতের চিহ্ন, দংশনের চিহ্ন হিসাবে দাঁতের দাগ, এবং যৌন অঙ্গ কর্তনের প্রমাণ পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে ধর্ষিত হওয়ার সময় আত্মরক্ষার জন্যে ধর্ষিতা চিৎকার করে ওঠে এবং অপরাধী তা বন্ধ করবার জন্যে মুখে কাপড় বেঁধে বা গুঁজে দেওয়ায় বা শ্বাসনলী চেপে ধরায় ধর্ষিতার মৃত্যু হতে পারে। এক বা একাধিকের ধর্ষণের সময় বিভিন্ন অত্যাচার অনেক সময় মৃত্যুর কারণ হয়ে থাকে।

ধর্ষণ সম্বন্ধীয় তথ্য অনুসন্ধানের সময় ধর্ষিতার দেহে ধস্তাধস্তির চিহ্ন, গলা বা মুখ চেপে ধরার চিহ্ন, হাত, পা ও দেহের অন্যান্য অংশে ছড়ে যাওয়ার দাগ, কাঁধ, হাঁটু, উরু, যৌনাঙ্গ প্রভৃতিতে বলাৎকারের বিভিন্ন

চিহ্নের সন্ধান পাওয়া যায়। এ ছাড়া অপরাধীর শুক্র, যৌন কেশ, নখের আঘাত, ইত্যাদির চিহ্নের জন্যে ধর্ষিতার দেহে বিশেষ ভাবে সন্ধান করা উচিত। ধর্ষিতাকে অজ্ঞান করবার প্রচেষ্টায় কোনো রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করা হলে তার অবশেষ চিহ্নের সন্ধান করা উচিত ধর্ষিতার জামাকাপড় অথবা তার আশেপাশে। ধর্ষিতার মৃত্যু ঘটলে অনতি-বিলম্বে শব ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা করা বিধেয়।

অনেক ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে অহেতুক ধর্ষণের নালিশ আনা হয়ে থাকে। প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছা, মস্তিষ্ক বিকৃতি, গর্ভবতী হওয়ার লজ্জা থেকে পরিত্রাণের ইচ্ছা এবং অসামাজিক যৌন সংগমের ঘটনা প্রকাশ হয়ে যাওয়ার লজ্জা থেকে পরিত্রাণ পাবার চেষ্টা ইত্যাদি কারণে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে ধর্ষণের অপবাদ দেওয়া হয়ে থাকে। স্বেচ্ছায় আত্মদানের পর কলঙ্কের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যে অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের উপর দোষারোপ করা হয়ে থাকে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে জবানবন্দী গ্রহণের পর উভয় পক্ষকে বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করা ও যে স্থানে যৌনসংগম ঘটেছিল সেই স্থানে বলাৎকারের সম্ভাব্যতা বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করা উচিত। পাশবিক অত্যাচার অথবা পাশবিক অত্যাচারের সঙ্গে নারী হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির দেহ এবং জামাকাপড় অনতিবিলম্বে পরীক্ষা করা কর্তব্য। অভিযুক্ত ব্যক্তির মুখে, হাতে, বাহুতে ছড়ে যাওয়ার দাগ, কামড়ানোর দাগ, ধুলো বা কাদার দাগ, যৌন অঙ্গে স্ত্রী-যৌনকেশ এবং যোনিপথে ক্লেদযুক্ত কোষ ইত্যাদি বিশেষ বিচক্ষণতার সঙ্গে লক্ষ্য করা বাঞ্ছনীয়। ঘটনাস্থলে অথবা পুরুষ বা নারীর দেহে রক্ত লেগে থাকলে ঐ রক্ত কোন শ্রেণীর তা পরীক্ষা করা উচিত। কারণ অপরাধী এবং ধর্ষিতার দেহের রক্তের শ্রেণী এবং ঘটনাস্থলে অথবা উহাদের দেহে লেগে-থাকা রক্তের শ্রেণী সাধারণতঃ এক হওয়া স্বাভাবিক।

কয়েক ক্ষেত্রে যৌন অঙ্গ স্বেচ্ছায় কর্তনের ফলে মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যায়। এই সমস্ত ব্যক্তিরা যৌন বিকৃতিতে ভোগে, এটা এক ধরনের মানসিক অসুস্থতা। নিজের দেহের বিকৃতিজনিত যন্ত্রণার

মাধ্যমে এরা আনন্দ উপভোগ করে।

(ভ্রূণ হত্যা ও তজ্জনিত মৃত্যু)

গর্ভপাত দ্বারা ভ্রূণ হত্যা করার জন্য সাধারণতঃ জরায়ু সঙ্কোচক ওষুধ প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া যোনিপথে শল্য প্রবেশ করিয়ে ভ্রূণ হত্যাও বিশেষ প্রচলিত। এই ধরনের হত্যাকাণ্ডের সময় গর্ভপাত হওয়ার পর বিষদুষ্টির প্রভাবে মৃত্যু হয়ে থাকে।

এই ধরনের অপরাধ অনুসন্ধানের সময় যৌন অপরাধ অনুসন্ধানের প্রতিটি পন্থার উপর লক্ষ্য রাখতে হবে। এ-ছাড়া ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত প্রতিটি জিনিসের মধ্যে আঙ্গুলের বা হাতের ছাপ বিশেষ ভাবে সন্ধান করতে হবে। এই ধরনের অপরাধীরা ব্যবহৃত জিনিস পত্রের উপর হাত বা পায়ের ছাপ সাধারণতঃ নিশ্চিহ্ন করবার সুযোগ পায় না বা করে না। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপরাধ কাহিনী প্রকাশ পাবার সম্ভাবনা কম বা একেবারে নেই বলে অপরাধীরা মনে করে।

(শিশুহত্যা)

অধিকাংশ শিশুহত্যার জন্য শিশুর মাতাই অপরাধী, ক্ষেত্র বিশেষে দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রভাব থাকাও অসম্ভব নয়। অনেক ক্ষেত্রে শিশুর জন্মের পরদিনই বা কয়েক দিন বাদেই তাকে হত্যা করা হয়; আবার অনেক সময় জন্মের অনেক পরেও হত্যা করা হয়ে থাকে। শিশুকে হত্যা করবার জন্যে ইচ্ছাকৃত অবহেলা, অস্ত্রের আঘাত, শ্বাসরোধ, মুখে কাপড় গুঁজে দেওয়া, জলে ডুবিয়ে দেওয়া, উঁচু জায়গা থেকে ফেলে দেওয়া ইত্যাদি পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়ে থাকে। এই ধরনের অপরাধের তদন্ত অপেক্ষাকৃত সময়সাপেক্ষ ও কঠিন। অত্যন্ত ধৈর্য ও বীক্ষণ শক্তির সঙ্গে এই অনুসন্ধানের তথ্য সংগ্রহ করা উচিত।

(অগ্নিসংযোগে হত্যা)

কতকগুলি ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তিকে আগুনের সাহায্যে দগ্ধ করা হয়ে থাকে। হত্যা করার পর অপরাধী নিহত ব্যক্তিকে বিকৃত করবার জন্যে অথবা আত্মহত্যা প্রতিপন্ন করবার জন্যে মৃতদেহে অগ্নিসংযোগ করতে পারে। আবার কতক ক্ষেত্রে অপরাধী আগুনে পুড়িয়েও কোনো

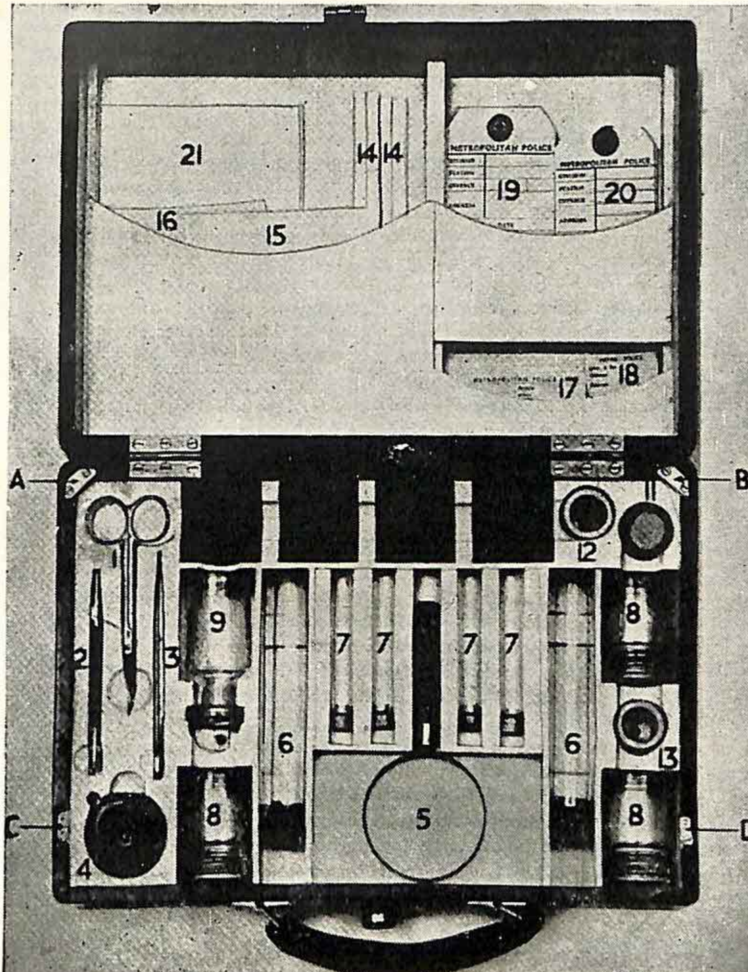
ব্যক্তিকে হত্যা করতে পারে। পুড়ে-যাওয়া দেহের আকৃতির বৈশিষ্ট্য আছে, সুতরাং ভুল হবার কিছু নেই। তবে পুড়িয়ে মারা হয়েছে অথবা মেরে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে—এ বিষয়ে সঠিক জানবার জন্যে অপরাধ-বিশেষজ্ঞ কোনো চিকিৎসকের নির্দেশে রাসায়নিক পরীক্ষা এবং শব ব্যবচ্ছেদের সাহায্য গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। দেহের বিভিন্ন অংশে দড়ি বা ফাঁসের দাগ, রক্তের দাগ বা চিহ্ন, আঘাতের চিহ্ন, ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করা উচিত। আত্মঘাতীরা আত্মহত্যার জন্যে অনেক ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় দেহে অগ্নি সংযোগ করে থাকে। বেশির-ভাগ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে—এই সমস্ত আত্মঘাতীদের মৃত্যু ঘটবার আগেই ঘটনাটি প্রকাশ পেয়ে যায়। আবার কয়েক ক্ষেত্রে আগুন ধরবার পর স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া জনিত কারণে মৃত্যু ঘটে থাকে। তথ্য প্রমাণ এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করার পর এইসব ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কর্তব্য।

(বিষ প্রয়োগে হত্যা)

যে সমস্ত ক্ষেত্রে মৃত্যুর জন্য বিষ গ্রহণ বা বিষ প্রয়োগ দায়ী সেই সমস্ত ক্ষেত্রে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে প্রধানতঃ চিকিৎসকের মতামত এবং রসায়নাগারের রাসায়নিক বিশ্লেষকের মতামতের উপর নির্ভর করতে হয়। তথ্য অনুসন্ধানের সহায়ক কতকগুলি বিষক্রিয়ার লক্ষণ নিচের তালিকায় দেওয়া হলো।

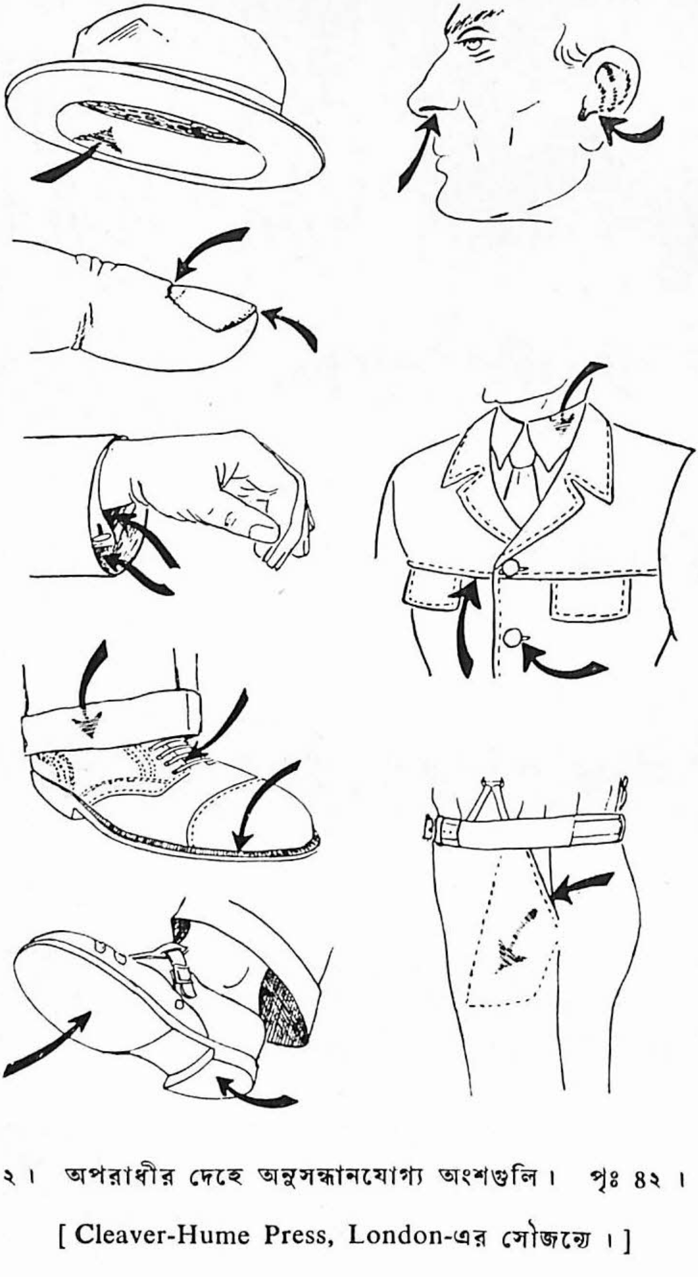
(১) কার্বলিক এ্যাসিড, নাইট্রিক এ্যাসিড, সালফিউরিক এ্যাসিড ইত্যাদি তীব্র অম্লপদার্থ খাওয়ার ফলে মৃত্যু হলে মুখ, মুখ-বিবর ও গলার ভিতরের বিভিন্ন অংশে এ্যাসিড-ক্ষতের চিহ্ন পরিদৃষ্ট হবে।

(২) কার্বলিক এ্যাসিড, লাইজল, এ্যামোনিয়া ইত্যাদি খেয়ে মৃত্যু হলে ঐ জিনিসগুলির বিশিষ্ট গন্ধ পাওয়া যাবে। ফসফরাস, হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড, সালফিউরিক এ্যাসিড, এ্যাসেটিক এ্যাসিড ইত্যাদি মৃত্যুর কারণ হলে সাধারণতঃ মৃত্যুর পূর্বে ঐ ব্যক্তি বমি করে থাকে। ঐ বমির রঙ নস্যির মত দেখায়



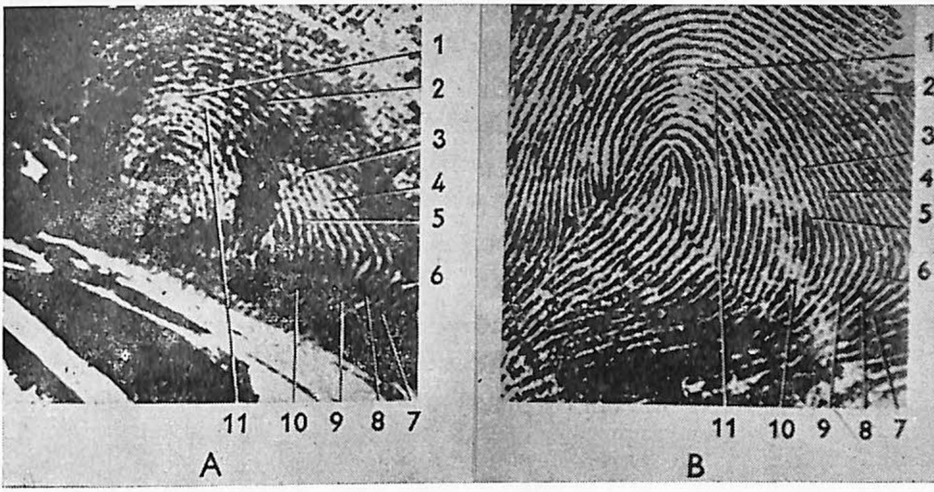
১। মার্ডার ব্যাগ (পৃ-৪০) ঃ (1) কাঁচি, (2) ছুঁচ, (3) ছোট সন্না, (4) ৩´ লম্বা মাপবার ফিতা, (5) ম্যাগনিফাইং গ্লাস, (6) ছোট টিউব, (7) ছোট লম্বা টিউব, (8) প্যাঁচওয়ালা কাঁচের ছিপিসহ বোতল, (9) ফোঁটা-ফেলা কাঁচের ছিপি দেওয়া বোতল, (10) পিচবোর্ডের বাক্স, (11) রবারের পটি, (12) ফিতে, (13) সাদা ব্যাণ্ডেজ, (14) তুলো, (15) স্বচ্ছ-কাগজের থলি—৬টি, (16) ঐ দুটো, শক্ত কোণা লাগানো চ্যাপ্টা, (17) ও (18) লেবেল আটকানোর সরঞ্জাম, (19) ও (20) লেবেল বাঁধবার সরঞ্জাম এবং (21) দুই দিস্তা কাগজ। (A—D) তদন্তকার্যের নির্দেশাবলী সম্বলিত ফাইল রাখার বিশেষ ব্যবস্থা।

[Cleaver-Hume Press, London-এর সৌজন্যে ।]



২। অপরাধীর দেহে অনুসন্ধানযোগ্য অংশগুলি। পৃঃ ৪২।

[Cleaver-Hume Press, London-এর সৌজন্যে।]



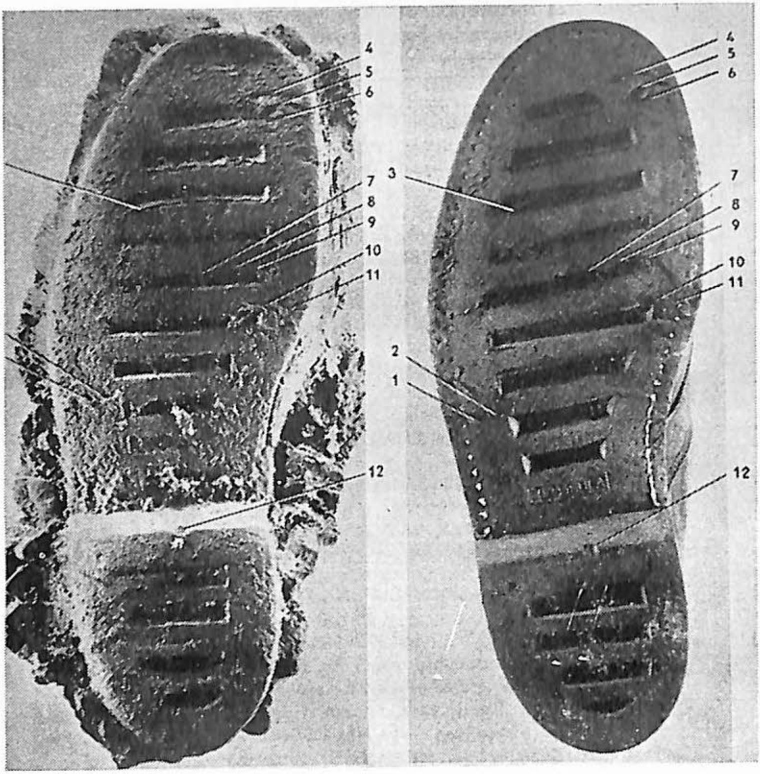
৩। (A) প্রকৃত অপরাধীর, (B) সন্দেহভাজন ব্যক্তির আঙ্গুলের ছাপ। পৃঃ ৪৩-৪৭।

[Cleaver-Hume Press, London-এর সৌজন্যে।]

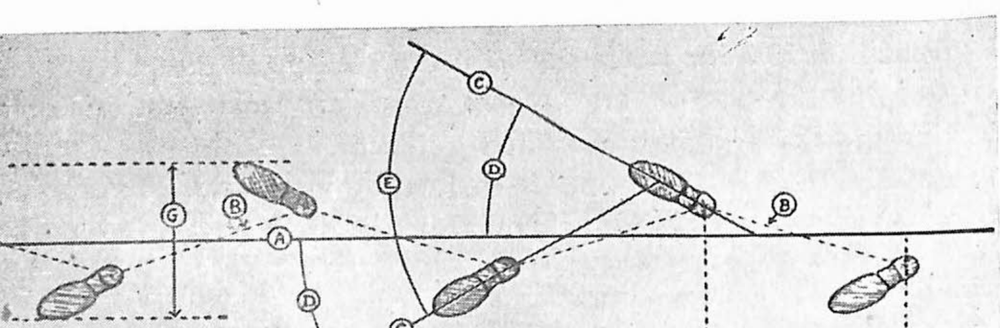


৪। ভাঙা কাঁচের গায়ে লেগে-থাকা আঙ্গুলের ছাপ। পৃঃ ৪৩-৪৭।

[Cleaver-Hume Press, London-এর সৌজন্যে।]

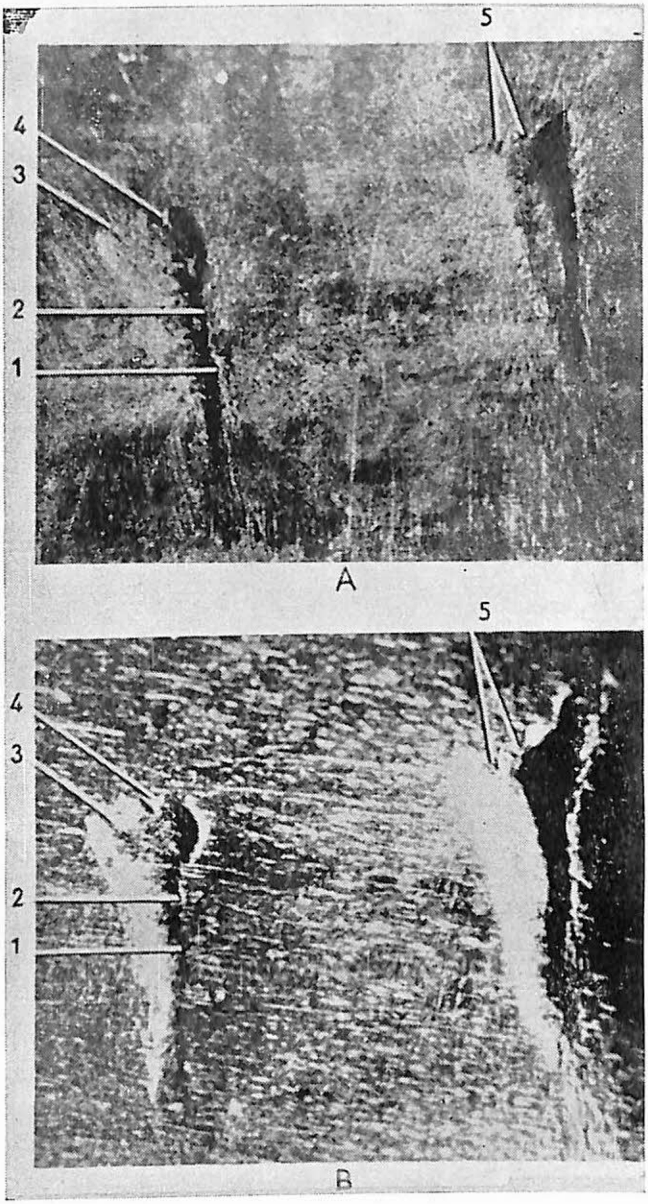


৫। ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত অপরাধীর জুতোর ছাপের ছাঁচ (বামে) ও অপরাধী সন্দেহে অভিযুক্ত ব্যক্তির জুতোর মধ্যে (দক্ষিণে) সাদৃশ্য। পৃঃ ৪৯।



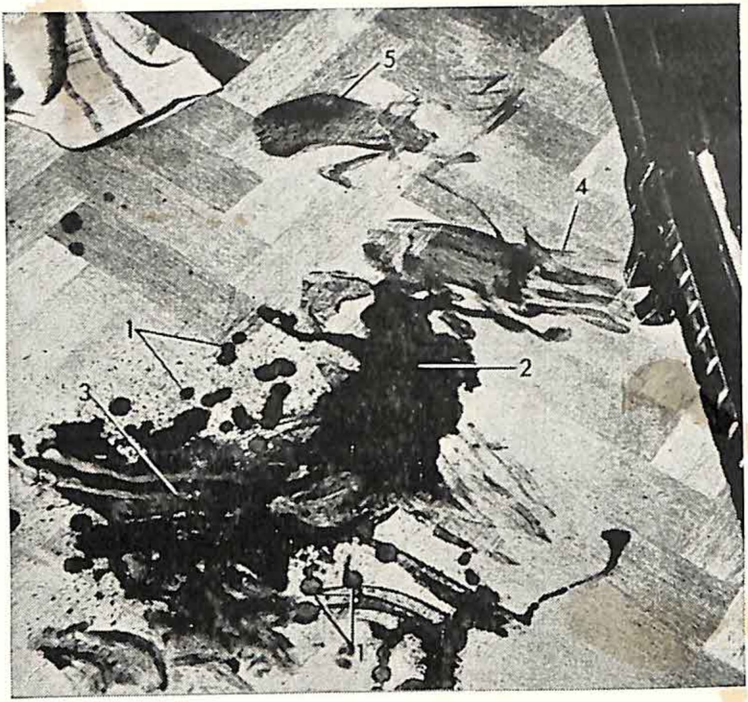
৬। চলনভঙ্গীর ধাঁচ বা Gait pattern। পৃঃ ৪৮। (A) গতিপথ (B) পদক্ষেপ (C) পায়ের পাতা ফেলা (D) "এ" এবং "সি"র অন্তর্বর্তী কোণ (E) দুটি পায়ের পাতার অন্তর্বর্তী কোণ (F) চলার সময় পদক্ষেপের দূরত্ব এবং (G) ব্যবধান।

[Cleaver-Hume Press, London-এর সৌজন্যে]

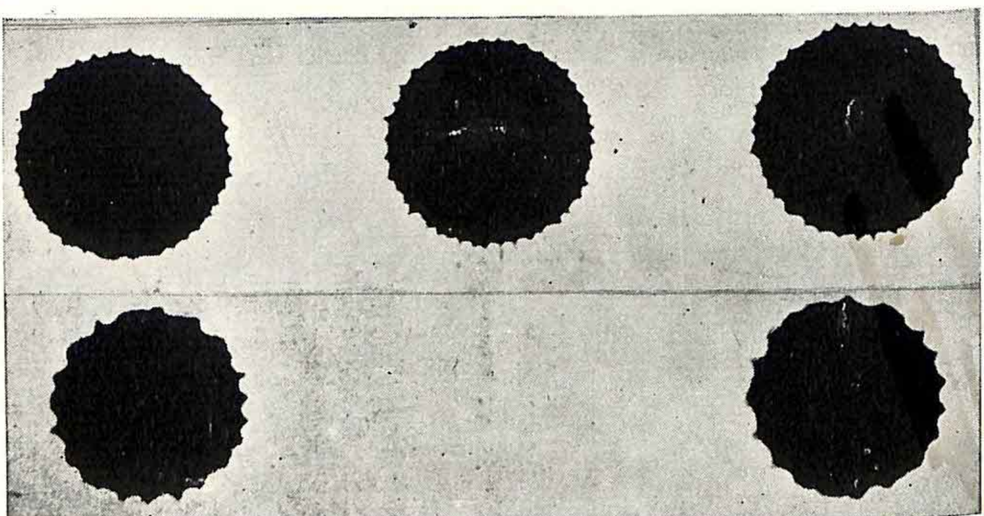


৭। দুটি ভিন্ন স্থানে সিন্দুক ভাঙ্গার সময় একই যন্ত্র ব্যবহার করার ফলে ভাঙ্গা জায়গাগুলির মধ্যে সাদৃশ্য-চিহ্ন। পৃঃ ৫০

[Cleaver-Hume Press, London-এর সৌজন্যে]

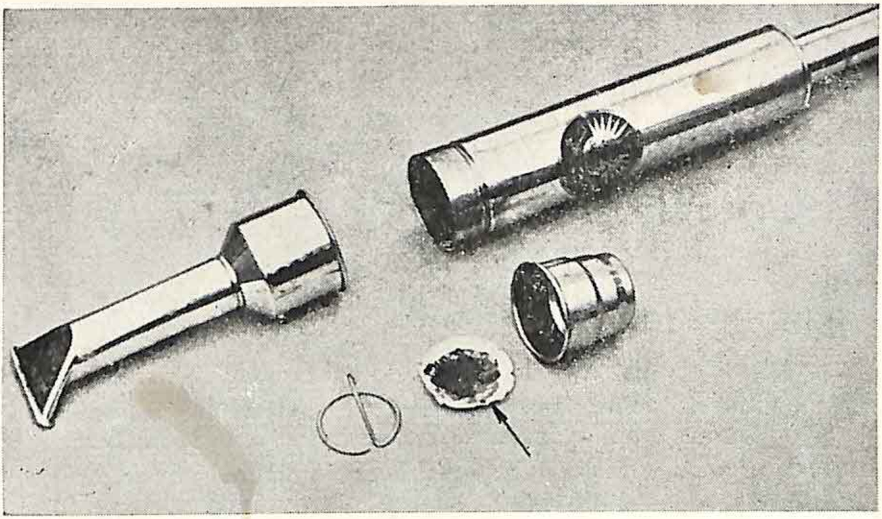


৮। রক্ত চিহ্ন ঃ (1) ফোঁটা পড়া (2) জমাট-বাঁধা চাপ-চাপ (3) টেনে-নেওয়া হাতের চিহ্ন (4) রক্তাক্ত হাতের ছাপ (5) রক্তমাখা বস্ত্র। পৃঃ ৫১-৫২।

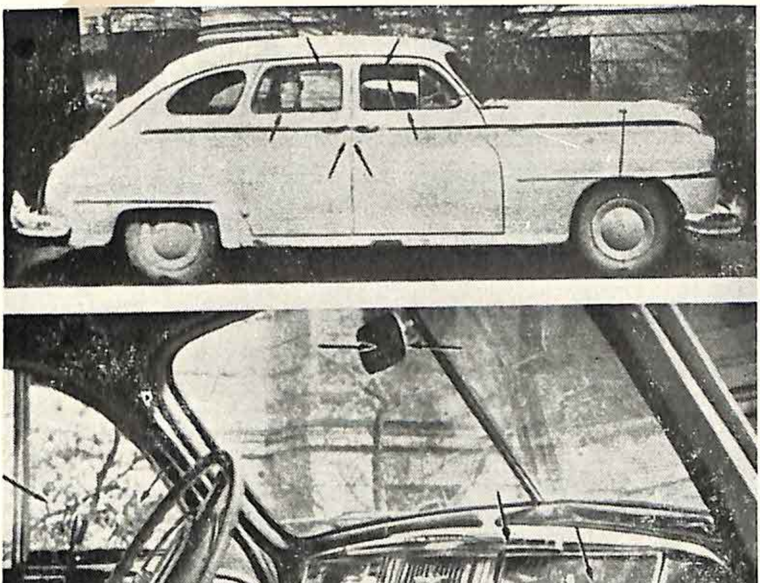


৯। কুড়ি থেকে চল্লিশ ইঞ্চি উঁচু থেকে পড়া রক্তের ফোঁটার (উপরে) এবং চল্লিশ থেকে ষাট ইঞ্চি উঁচু থেকে পড়া (নীচে) রক্তের ফোঁটার আকৃতি-বৈশিষ্ট্য। পৃঃ ৫২।

[Cleaver-Hume Press, London-এর সৌজন্যে]

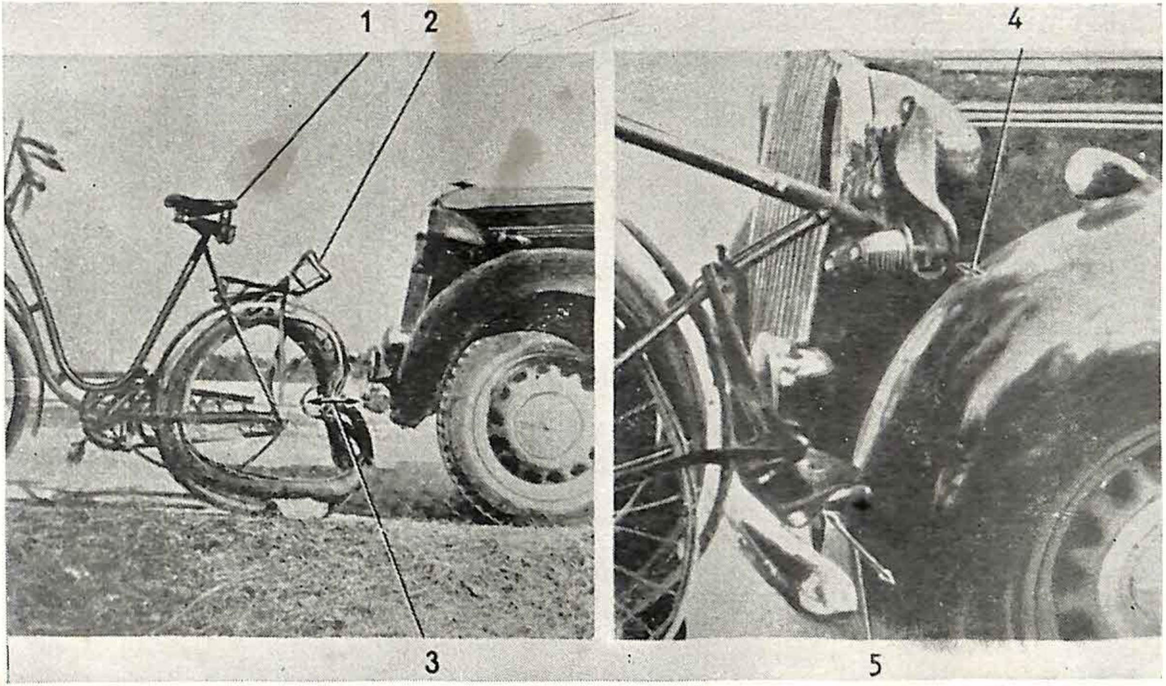


১০। বিশেষ ছাঁকনিযুক্ত ধূলা-সংগ্রাহক যন্ত্র (খোলা অবস্থায়)। পৃঃ ৫৩।



১১। চুরি-যাওয়া গাড়ীর তীর-চিহ্নিত স্থানগুলিতে সাধারণতঃ আঙ্গুলের বা হাতের ছাপ পাওয়া যায়। পৃঃ ৫৪-৫৫।

[Cleaver-Hume Press, London-এর সৌজন্যে]

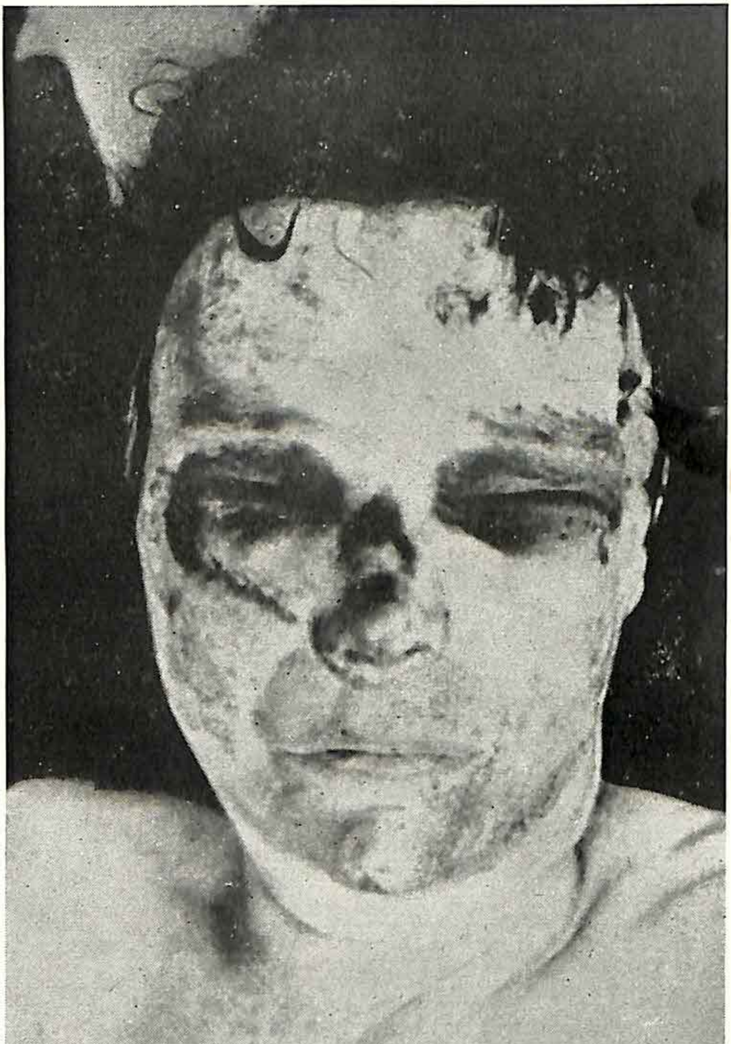


১২। মোটরগাড়ীর সঙ্গে সাইকেলের দুর্ঘটনার অবস্থা সৃষ্টিকরণ ঃ (1) ঘষে-যাওয়ার দাগ (2) ভাঙ্গা অবস্থায় লাগেজ-কেরিয়ার (3) মোটরের সামনের ক্ষতিগ্রস্ত বাফার এবং সাইকেলের পিছনের চাকা, এবং (4), (5) ধাক্কার অবস্থায় গাড়ী দুটির আনুমানিক সংস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে দাগগুলির নিরীক্ষিকরণ। পৃঃ ৫৬। [Cleaver-Hume Press, London-এর সৌজন্যে]



১৩। নিহত হওয়ার সময় এই ব্যক্তি শরীরের ডান দিকে ভর করেছিল। চামড়ার পরিবর্তন তীর চিহ্নের সাহায্যে দেখানো হয়েছে। বাম হাতের অনমনীয়তা লক্ষণীয়। পৃঃ ৫৮।

[Cleaver-Hume Press, London-এর সৌজন্যে]



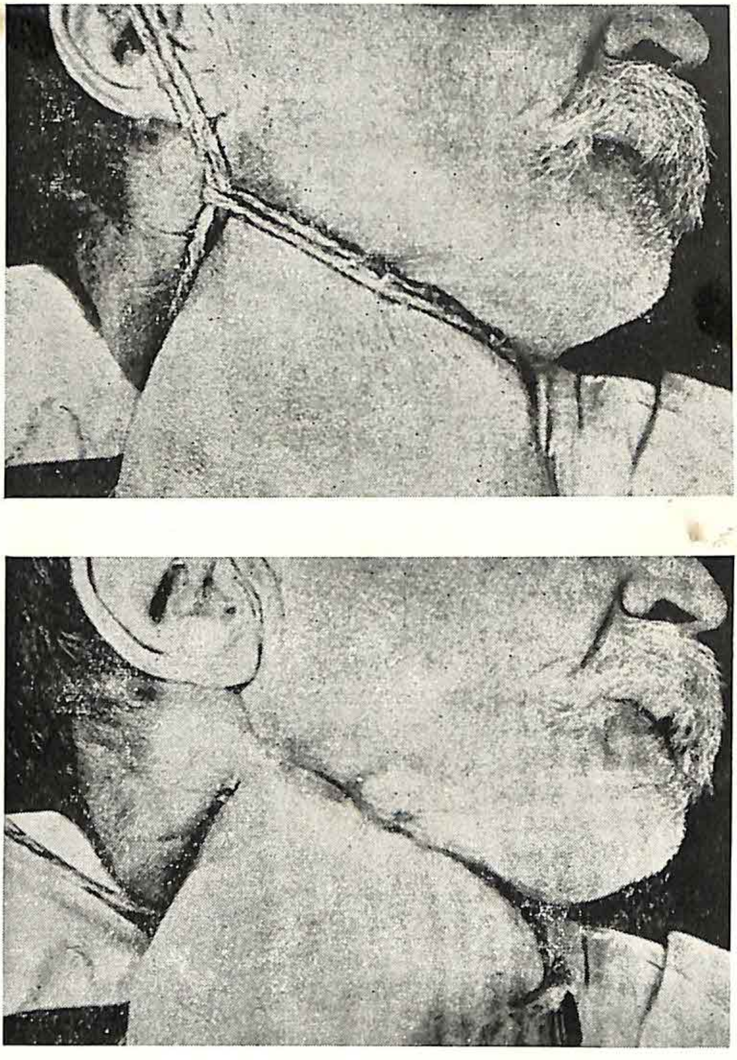
১৪। নিহত ব্যক্তির চোখে কালশিরার দাগ—মাথার পেছনে মারাত্মক আঘাতের ফল। পৃঃ ৫৯।

[Cleaver-Hume Press, London-এর সৌজন্যে]



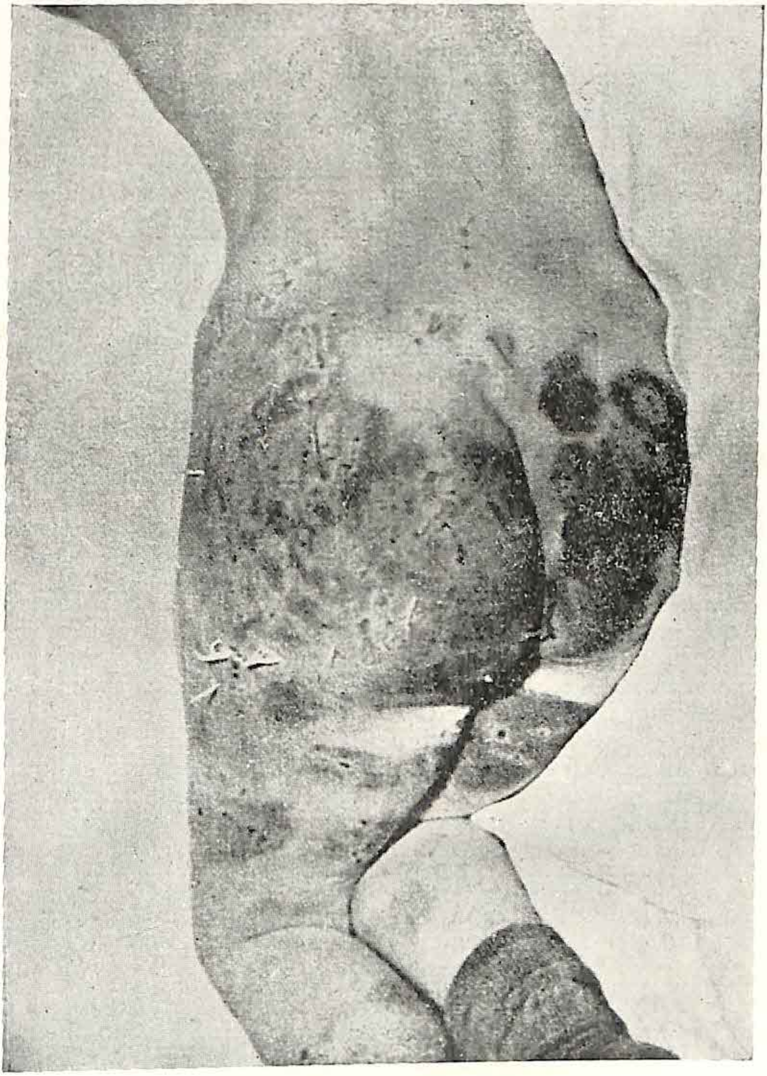
১৫। আত্মহত্যা ঃ ডিনামাইট মুখে দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটাবার পর নিহত ব্যক্তির মুখের বিকৃতি। পৃঃ ৬০।

[Cleaver-Hume Press, London-এর সৌজন্যে]



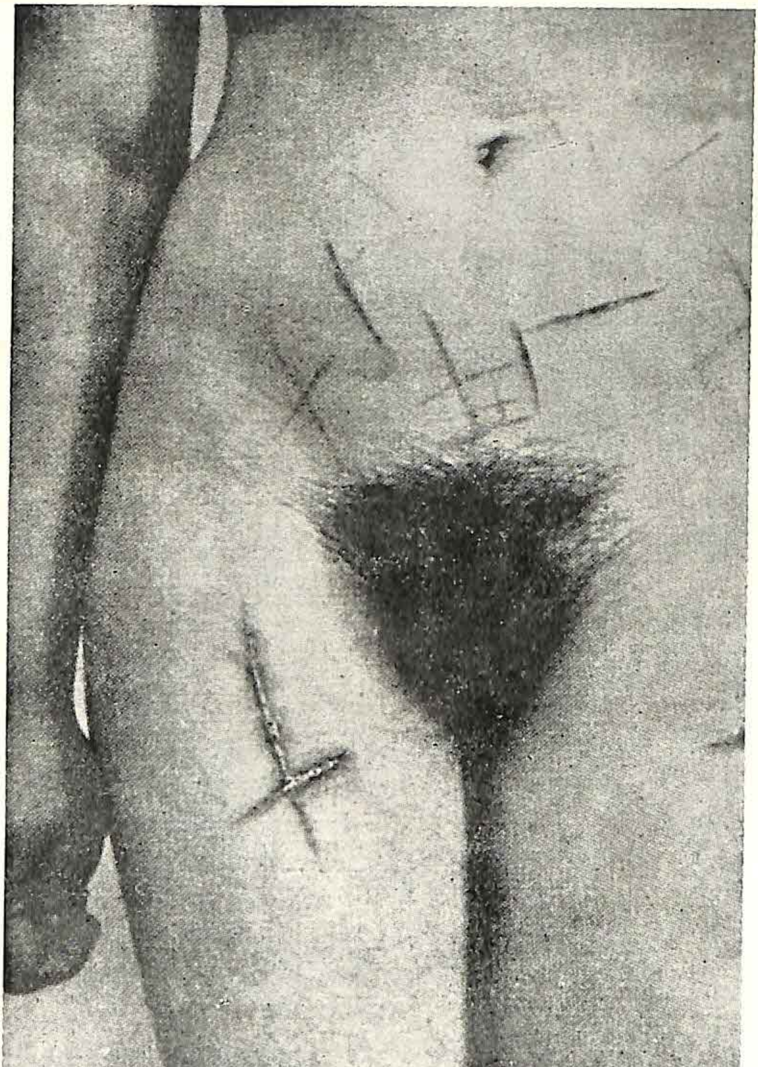
১৬। আত্মহত্যা ঃ গলায় দড়ি দিয়ে (উপরে) এবং মৃতদেহ থেকে দড়ির ফাঁস অপসারণের পর দড়ির দাগ (নীচে)। পৃঃ ৬০।

[Cleaver-Hume Press, London-এর সৌজন্যে]



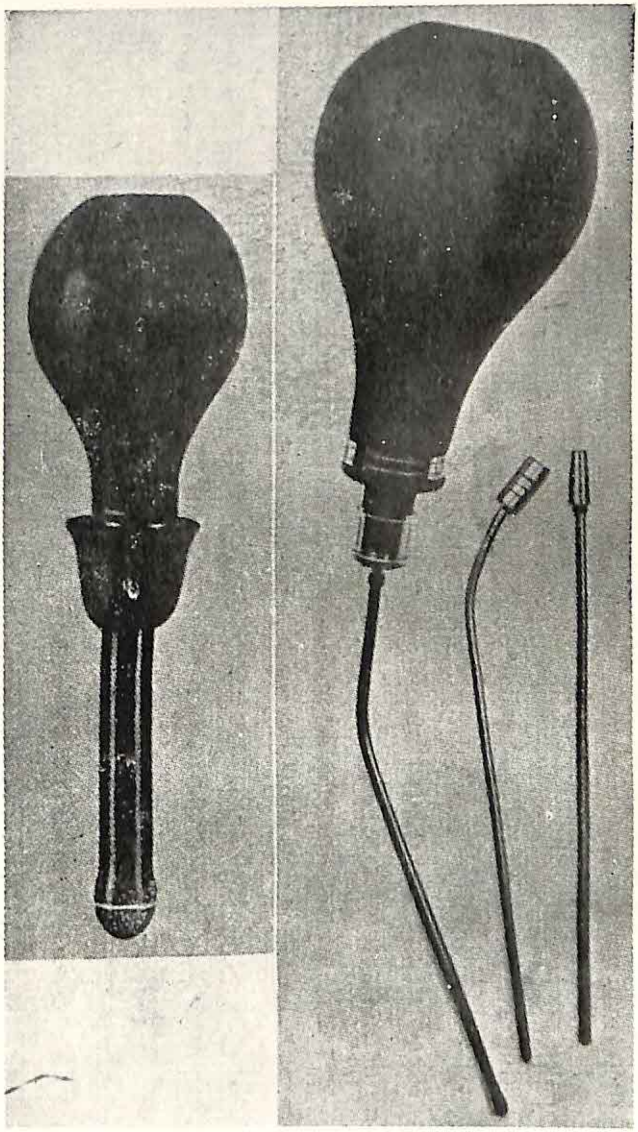
১৭। ধর্ষিতার দেহে অত্যাচারের চিহ্নগুলি। পৃঃ ৬১-৬২।

[Cleaver-Hume Press, London-এর সৌজন্যে]



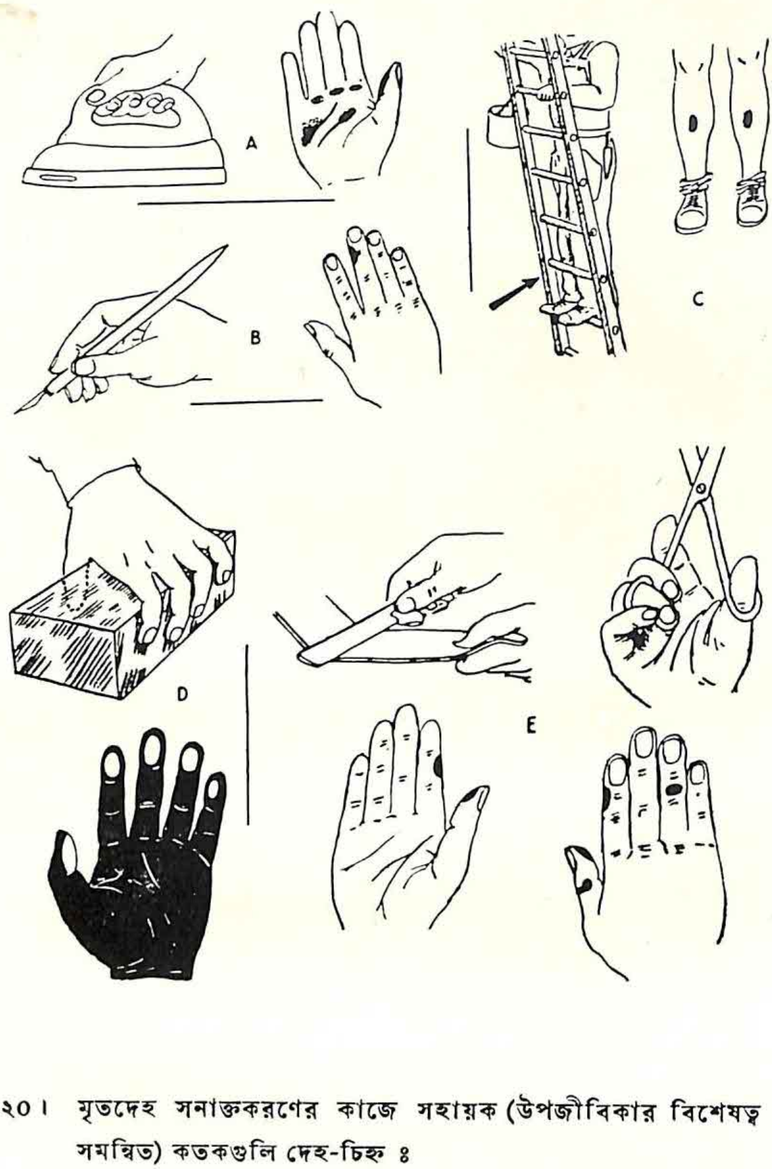
১৮। ধর্ষিতার যৌনাঙ্গের নিকট অপরাধীর সৃষ্ট ক্ষুরের দাগ। পৃঃ ৬২।

[Cleaver-Hume Press, London-এর সৌজন্যে]



১৯। গর্ভপাতের জন্য অপরাধীদের ব্যবহৃত কয়েকটি সরঞ্জাম।
পৃঃ ৬৩।

[Cleaver-Hume Press, London-এর সৌজন্যে]



২০। মৃতদেহ সনাক্তকরণের কাজে সহায়ক (উপজীবিকার বিশেষত্ব সমন্বিত) কতকগুলি দেহ-চিহ্ন ঃ

(A) নিয়মিত ইস্ত্রি করার ফলে হাতের কড়া ;

(B) কলমজীবীর হাতের আঙ্গুলের কড়া ;

(C) পোষ্টার লাগানোর কাজে নিযুক্ত ব্যক্তির পায়ের হাড়ের উপর কড়া ;

(D) রাজ-মিস্ত্রির হাতের কড়া ;

(E) নাপিতের হাতের কড়া । পৃঃ ৬৬-৬৮ ।

[Cleaver-Hume Press, London-এর সৌজন্যে]

অথবা কফির রঙের মত। ফসফরাস মিশ্রিত বমির মধ্যে পেঁয়াজের গন্ধ পাওয়া যায়।

(৩) হাইড্রোসায়ানিক এ্যাসিডে মৃত্যু হলে মৃতদেহের মুখে, ঠোঁটে ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে রক্তিম আভা দেখতে পাওয়া যায়। কার্বন মনোক্সাইডে মৃত্যু হলে অনুরূপ লালচে ভাবের মাত্রা অধিক থাকে।

(৪) আফিম, মরফিয়া বা নিকোটিনের প্রভাবে মৃত্যু হলে চোখের তারা দুটি সঙ্কুচিত অবস্থায় দেখা যায়। এ্যাট্রোপিন, এ্যাল্-কোহল, কোকেন, বেনজিড্রিন জাতীয় বিষক্রিয়ায় চোখের তারা দুটি প্রসারিত দেখা যায়।

বিষক্রিয়ায় মৃত্যুর তদন্তের সময় মনে রাখতে হবে—ঘটনাস্থলের তথ্যাদি ও বিভিন্ন সাক্ষীর জবানবন্দীর উপর নির্ভর করে স্থির করতে হবে যে হত্যা, আত্মহত্যা ও নিছক দুর্ঘটনা এই তিনটির মধ্যে কোনটি মৃত্যুর জন্যে দায়ী। শব ব্যবচ্ছেদজনিত পরীক্ষা থেকে বিষের নাম ও পরিমাণ জানা যায়।

অনেক সময় খাদ্যের বিষাক্ত ক্রিয়া সমগ্র পরিবারের মৃত্যুর কারণ হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত খাবার জিনিসপত্র এবং রাধবার পাত্রগুলি বিশেষভাবে পরীক্ষা করা কর্তব্য। মৃত ব্যক্তির মল, মূত্র, থুতু, বমি ইত্যাদির প্রত্যেকটির বিশেষভাবে রাসায়নিক বিশ্লেষণে বিষের সন্ধান পাওয়া যায়। সুতরাং অনুসন্ধানকারীর পক্ষে ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত ঐ জিনিসগুলিকে সযত্নে সংরক্ষণ করে পরীক্ষার জন্যে পাঠানো প্রয়োজন।

(ট্রাঙ্ক স্যুটকেস বা অনুরূপ আধারের মধ্যে প্রাপ্ত বিচ্ছিন্ন মৃতদেহ)

হত্যার পর অপরাধী অনেক সময় নিহত ব্যক্তির দেহ সম্পূর্ণ খণ্ড খণ্ড করে ঐ খণ্ড অংশগুলোকে বাক্স অথবা থলির ভেতর পুরে লুকিয়ে রাখে, পুঁতে দেয় অথবা কোনো জায়গায় ফেলে দিয়ে আসে। সাধারণতঃ অপরাধী মৃতদেহটিকে পুরু কাপড় বা কম্বলে জড়িয়ে নিয়ে বাক্সবন্দী করে। এই শ্রেণীর অপরাধীদের মানসিক বিকৃতি আছে বলে অনুমান

করা হয়। এই ধরনের হত্যাকাণ্ডে যে স্থানে মৃতদেহ পাওয়া যায়, সেই স্থানটি সচরাচর অকুস্থল হয় না। সুতরাং যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে মৃতদেহ ও তার আধার থেকে প্রাপ্ত প্রতিটি জিনিসকে তথ্য হিসাবে সংরক্ষিত করতে হবে। মৃতদেহের বিচ্ছিন্ন অংশগুলিতে ও যার মধ্যে মৃতদেহ রাখা হয়েছিল তেমন স্যুটকেস, ট্রাঙ্ক ইত্যাদিতে অপরাধীর হাত ও আঙুলের ছাপের সন্ধান বিশেষভাবে করতে হবে। মৃতদেহের কাপড় জামা এবং যে কাপড় দিয়ে মৃতদেহ জড়ানো হয়েছিল তাইতে ধোপার চিহ্ন পাওয়া গেলে সেটি হবে এই হত্যাকাণ্ডের অনুসন্ধানে বিশেষ প্রয়োজনীয় সূত্র।

(**মৃতদেহ সনাক্তকরণ**)

সাধারণতঃ নিহত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব বা পরিচিত ব্যক্তিদের সাহায্যে অথবা নিহত ব্যক্তির কাছ থেকে পাওয়া পরিচয়ের সহায়ক উপাদান বা নিদর্শনের (নাম ঠিকানা লেখা কার্ড, নোট বই, চিঠিপত্র ইত্যাদির) সাহায্যে মৃতদেহ সনাক্ত করা হয়ে থাকে। অপরাধ বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন যে উল্লিখিত তথ্য প্রমাণগুলির সত্যতা সম্বন্ধে প্রতিক্ষেত্রেই সচেতন থাকা উচিত। সামান্য সন্দেহের উদ্রেক হলে ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত প্রমাণগুলি ছাড়া সনাক্তকরণের অন্যান্য পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করা কর্তব্য। যে সমস্ত মৃতদেহ বিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায় সেইগুলির সনাক্তকরণ পদ্ধতি জটিল। পাশ্চাত্যের অপরাধতত্ত্ব-বিদগণ এই সকল ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলির সাহায্য গ্রহণ করে থাকেন।

(১) নিহত ব্যক্তির সম্ভাব্য আকৃতির বর্ণনা এবং মৃতদেহের ছবি প্রকাশ করে তার সনাক্তকরণের জন্য ঘোষণা করা (প্রয়োজনবোধে পুরস্কার ঘোষণা করা)।

(২) মৃতদেহের আঙ্গুলের ছাপ গ্রহণ করা এবং ঐ ব্যক্তির জীবদ্দশায় (কর্মস্থল ও বাড়ির) ব্যবহৃত জিনিসপত্র ও আসবাব থেকে আঙ্গুলের ছাপ সংগ্রহ করে—দুইয়ের তুলনা করা। আঙ্গুলের বা হাতের ছাপ সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু মৃতদেহের অবস্থা

বিকৃত হলে অন্য কতকগুলি বিশেষ পন্থা অবলম্বন করা হয়ে থাকে।

কতকগুলি ক্ষেত্রে আঙ্গুলের মাথাগুলো এমন শক্ত বা শুকনো হয়ে যায় যে আঙ্গুলের চামড়ার সূক্ষ্ম খাঁজগুলির মধ্যের ফাঁক বুজে যায়, ফলে ছাপ তোলা সম্ভব হয় না। এই ক্ষেত্রে অনুসন্ধান কর্তৃপক্ষের অনুমতি (এই দেহের অঙ্গচ্ছেদ করা যেতে পারে কিনা) গ্রহণের পর কোনো অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্যে আঙ্গুলের ডগার দিককার একটি পাব কেটে নিয়ে সেটি টেস্ট-টিউবের ভিতর এক বা দু'দিন জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। এই সময় বিভিন্ন আঙ্গুলের উপরকার পাবগুলো ভিন্ন ভিন্ন টেস্ট-টিউবে রাখা প্রয়োজন, নইলে পরে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। এই ভাবে আঙ্গুলের মাথার চামড়া নরম করে নিয়ে ছাপ গ্রহণের কালির সাহায্যে ছাপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সাধারণতঃ যে সমস্ত ক্ষেত্রে মৃতদেহের আঙ্গুলগুলি খুব বেঁকে যায় সেই সমস্ত ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করা হয়ে থাকে। মৃতদেহের আঙ্গুল সোজা অবস্থায় থাকলে আঙ্গুলের মাথার সন্ধিস্থলে ইন্‌জেকশন দেওয়ার সিরিঞ্জের সাহায্যে জল প্রবেশ করানো হয়ে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত আঙ্গুলের মাথার চামড়ার আকৃতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে না আসে ততক্ষণ জল প্রবেশ করানো কর্তব্য। এই অবস্থায় আঙ্গুলের মাথা যথেষ্ট শক্ত হয়ে উঠবে। এর পর ইন্‌জেকশন সিরিঞ্জের ছুঁচটি আস্তে আস্তে বাইরে বার করে নিয়ে এসে যথা নির্দিষ্ট উপায়ে ছাপ গ্রহণ করতে হবে।

যে সমস্ত ক্ষেত্রে আঙ্গুলের চামড়া দেহ থেকে খুলে আসে, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে আঙুলের মাথার চামড়া খুব সাবধানে কেটে নিয়ে দুটো কাঁচের স্লাইডের মাঝে খুব ভালভাবে রাখতে হবে। পরে ঐ কাঁচের স্লাইড দুটির মাঝখান দিয়ে জোরালো বৈদ্যুতিক আলো ফেলে আঙ্গুলের ছবি গ্রহণ করতে হবে। এতে আঙ্গুলের মাথার চামড়ার প্রতিটি সূক্ষ্ম রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

(৩) মৃতদেহ সনাক্তকরণে দেহের বিভিন্ন অংশের চিত্র গ্রহণ বিশেষ প্রয়োজনীয়। মৃতদেহের সম্পূর্ণ ছবি, বাম ও ডান পাশের ছবি,

কান, নাক, তিল চিহ্ন, দাঁতের আকৃতি, ক্ষত চিহ্ন, ইত্যাদির ছবি পৃথক-ভাবে গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। মৃতদেহের পচন শুরু হবার পূর্বেই এই সব চিত্রগুলি গ্রহণ করা কর্তব্য। যে সমস্ত মৃতদেহের পচন ক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে, সেই সমস্ত মৃতদেহের মুখের ছবি অপেক্ষা দেহের অন্য অংশের ছবি সনাক্তকরণের পক্ষে বিশেষ সহায়ক। কারণ, মুখের এমনি বিকৃতি ঘটে যে তার সাহায্যে সনাক্তকরণ প্রায় অসম্ভব হয়ে থাকে। দেহস্থিত বিভিন্ন চিহ্নগুলির চিত্রগ্রহণের সময় ঐ চিহ্নের পাশে বা উপরে মাপবার ফিতে বা রুল রেখে চিত্র গ্রহণ করা উচিত। প্রতি ক্ষেত্রেই দু-তিনখানা ছবি নিয়ে রাখা যুক্তিযুক্ত। পাশ্চাত্য অপরাধ-বিজ্ঞানীদের মতে জলে-ডোবা অথবা রক্তাক্ত মৃতদেহের চিত্রগ্রহণের সময় ফ্ল্যাস্‌-বাল্‌বের সাহায্য নেওয়া সমীচীন নয়। কারণ, ফ্ল্যাস-বাল্‌বের আলোর প্রতিফলনে অনেক সূক্ষ্ম চিহ্নের অস্তিত্ব ছবিতে অদৃশ্য থেকে যেতে পারে।

(৪) বিভিন্ন উপজীবীকায় কর্মরত লোকেদের দেহে কর্ম সংশ্লিষ্ট জিনিসপত্রের নিত্য ব্যবহারের চিহ্ন বর্তমান থাকে। সনাক্তকরণের সময় এই চিহ্নগুলি বিশেষ সাহায্য করে। ২০ নং ছবিতে এই ধরনের কয়েকটি চিহ্নের উল্লেখ করা হোলো।

(৫) মৃতব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্রাদিতে ধোপার বাড়ির বা লন্ড্রার ছাপ সনাক্তকরণের বিশেষ সহায়ক। এ ছাড়া মৃত ব্যক্তির জুতো, ঘড়ি, কলম প্রভৃতিতে প্রাপ্ত বিভিন্ন চিহ্ন, মনোগ্রাম, ইত্যাদি সনাক্তকরণের কাজে প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্ধান দেয়।

(৬) মৃতদেহের কঙ্কাল ছাড়া আর কোনো চিহ্ন না পাওয়া গেলে, ঐ দেহ স্ত্রীলোকের বা পুরুষের তা নির্ণয় করবার জন্যে নিম্নোক্ত হাড়-গুলির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশেষ সহায়ক।

(ক) বস্তি প্রদেশের গঠন (Pelvic structure)।

(খ) মাথার খুলির হাড় (Cranium)।

(গ) ঊর্ধ্ববাহুর সন্ধিস্থলের গঠন (Head of the joint of upper arm)।

(ঘ) বুকের হাড়ের গঠন (Breast bones)।

(ঙ) উরুর ও পায়ের হাড়ের গঠন (Thigh and shin bone)।

অভিজ্ঞ অস্থি-বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে উপরোক্ত হাড়গুলির চরিত্রের সাহায্যে স্ত্রী পুরুষ ভেদ নির্ণয় করা সহজসাধ্য।

(৭) দাঁতের অবস্থা পর্যবেক্ষণ মৃতদেহের বয়স অনুমান করার পক্ষে বিশেষ সহায়ক। বয়স বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে দাঁতে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

(ক) খাদ্যবস্তু চিবানোর দরুন ক্ষয়।

(খ) দাঁতের গোড়া আলগা হওয়া।

(গ) দাঁতের গোড়ায় ছোপ পড়া বা ময়লা জমা (cement)।

(ঘ) দাঁতের গোড়া ক্ষয়ে যাওয়া।

(ঙ) দাঁত ওঠার রাস্তা বুজে যাওয়া।

এই সমস্ত চিহ্নগুলির সাহায্যে অভিজ্ঞেরা বয়সের অনুমান করে থাকেন।

মৃতদেহ সনাক্তকরণ কতকগুলি ক্ষেত্রে বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি করে। উপরোক্ত আলোচনায় প্রদত্ত পদ্ধতিগুলির প্রয়োগ এবং অভিজ্ঞ অনুসন্ধানীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও বুদ্ধিমত্তার উপর সনাক্তকরণের সাফল্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে থাকে।

অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরাধী*

অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত কিশোর-কিশোরীদের কথা প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। দণ্ডনীতি ও দণ্ডবিধির তত্ত্বে এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এদের যেমন নিরপরাধ হিসাবে নিষ্কৃতি দেওয়া হয় না, ঠিক তেমনি প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের সমপর্যায়ে এদের বিচার করাও হয় না। এদের জীবনের বয়ঃসন্ধিকালে মনের আকাশ জুড়ে বিশৃঙ্খলতার মেঘ ওঠে, ব্যক্তি-মানসের সব সৌন্দর্য উচ্ছৃঙ্খলতার ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়। পরিণামে দিশেহারা হয়ে এরা কোথায় ভেসে চলে তা নিজেরাই বুঝতে পারে না। এই সময়ে এরা এমন কতকগুলো কাজ করে থাকে, যে-গুলো সমাজ ও সংস্কৃতির পরিপন্থী। শুধু তাই নয়, এদের এমন কিছু কাজ করতে দেখা যায়, যা নিঃসন্দেহে প্রচলিত রীতিনীতি, মূল্যবোধ বা আইনকানুনের পরিপ্রেক্ষিতে আপত্তিকর। কু-সংসর্গের প্রভাবে এদের উচ্ছৃঙ্খলতা এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছায় যার ফলে এরা পুলিসের হাতে ধরা পড়ে এবং বিশেষ ধারায় অভিযুক্ত হয়। বর্তমানে, বিশেষ আদালতে এদের বিচার হয় এবং আচরণ সংস্কারের উদ্দেশ্যেই এরা দণ্ডভোগ করে থাকে। অবশ্য অনেক সময়ে এদের মধ্যে কেউ কেউ এমন জঘন্য অপরাধ করে ফেলে যা প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদেরও হার মানায়। তবু আইন এদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি দেখায়, এদের ভবিষ্যৎ কল্যাণের কামনায়। অপ্রাপ্তবয়স্কদের প্রতি প্রযোজ্য দণ্ডনীতি ও দণ্ডবিধি মূলতঃ ওদের সুস্থ সমাজ-জীবন যাপনের মহৎ উদ্দেশ্যেই প্রণীত হয়েছে।

সাধারণতঃ সাত-আট বছরের ছেলেমেয়েদের বিরুদ্ধে দুষ্কৃতির কোনো অভিযোগ আদালতে স্বীকৃতি পায় না। অনুমান করা হয় যে আট

---

* গান্ধীবাদের অন্যতম প্রবক্তা এবং স্বনামধন্য নৃতত্ত্ববিদ্ স্বর্গীয় অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর উৎসাহে রচিত এবং তাঁরই নির্দেশে মনীষী বিনয় সরকার ইনস্টিটিউট্ অফ্ সোশ্যাল সায়েন্স সংস্থার মুখপত্রে লিখিত লেখকের ধারাবাহিক রচনাগুলি দ্রষ্টব্য।

বছর বয়সের পর থেকে তের বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের সুপরিকল্পিত ভাবে অপরাধ করার মত মানসিক পরিপূর্তি না থাকলেও দুষ্কৃতিমূলক কাজ বলতে কি বোঝায় তা বোঝবার এবং দৃষ্টি এড়িয়ে চলার ক্ষমতাও তাদের থাকে। চোদ্দ বছর বয়স থেকে একুশ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে পরিকল্পনা অনুযায়ী অপরাধ করার ক্ষমতা থাকা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। একুশ বছরের পর যে-কোনো যুবক বা যুবতী সব দিক থেকে সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে অপরাধ করবার উপযুক্ততা লাভ করে থাকে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে দৈহিক ও মানসিক পরিপূর্তির সামঞ্জস্য বজায় রেখে কাদের পক্ষে দুরভিসন্ধিমূলক পরিকল্পনা অনুযায়ী অপরাধ করা সম্ভব—সেই বিষয়ে ধ্যান দিয়েই অধুনাযুগের দণ্ডবিধি রচনা করা হয়েছে। এই কারণে বর্তমানের দণ্ডনীতি ও দণ্ডবিধি অপ্রাপ্তবয়স্কদের প্রতি যত সহানুভূতিশীল, প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতি ততোধিক নিস্পৃহ ও নির্মম। অবশ্য শুধুমাত্র বয়ঃসীমার ভিত্তিতে সমগ্র বিষয়টিকে বিচার করার অসুবিধাগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অত্যন্ত জটিলতার সৃষ্টি করে থাকে।

বুদ্ধির বা পর্যাপ্ত বিচার শক্তির অভাবে অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে এমন প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীর সংখ্যাও নেহাত উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু শুধু প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার জন্যেই তারা সব সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়—এদের ক্ষেত্রে দণ্ডভোগের পর স্বাভাবিক সমাজ-জীবন যাত্রার কথা দণ্ডবিধানের সময় বিশেষ খেয়াল করা হয় না। অথচ অত্যন্ত চতুর যে কোনো কট্টর স্বভাব-অপরাধী ক্ষেত্র বিশেষে কৈশোরের দোহাই দিয়ে দণ্ডনীতি এবং দণ্ডবিধির সব কিছু সহানুভূতিমূলক বিশেষ ব্যবস্থাগুলির সুযোগ নেয়। বয়সের মানদণ্ডে অপরাধীদের শ্রেণী বিচার করার সুযোগ সুবিধা অনেক বেশি বলেই নানা অসুবিধাকে মেনে নিয়েও বয়সের মানদণ্ডকে উপেক্ষা করা এখনও সম্ভব হয়নি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সাধারণতঃ সাত থেকে আঠার বছরের বয়ঃসীমায় অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের সীমীত করা হয়েছে। খুন, রাহাজানি, ডাকাতি, বলাৎকার, ইত্যাদি গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হলে অনেকক্ষেত্রে ষোল বছর

বয়সকেই সীমারেখা হিসাবে ধরা হয়ে থাকে। এখানে বয়সের মানদণ্ড ছেড়ে অপরাধের গুরুত্বের উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়—অর্থাৎ ঐ গুরুত্বপূর্ণ অপরাধ যার পক্ষে করা সম্ভব,ধরে নেওয়া হয় যে, সে নিশ্চয় কৈশোরেই অকাল পক্ক হয়ে উঠেছে। তা না হলে সে প্রাপ্তবয়স্কদের মত যোগ্যতা দেখিয়ে অপরাধটি করতে পারতো না। তাই এক্ষেত্রে অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও সে প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীর সঙ্গে তুলনীয়।

অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরাধী প্রসঙ্গে তিনটি বিষয় অবশ্য বিচার্য : (১) প্রাক্-কৈশোর থেকে কৈশোরোত্তর কাল পর্যন্ত বয়ঃসীমা ; (২) অভিযুক্ত অপ্রাপ্তবয়স্কদের বিচারের জন্য বিশেষ আদালত, তার বিচারনীতি, আচরণ ও সংস্কারমূলক দণ্ডবিধি ; এবং (৩) অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় অভিযুক্ত অপ্রাপ্তবয়স্কের দৈহিক এবং মানসিক যোগ্যতা নিরূপণ। এই বিষয়ে, 'ক্রিমিন্যাল ল অ্যাণ্ড অ্যাড্‌মিনস্ট্রেশন' গ্রন্থে অধ্যাপক মাইকেল এবং অধ্যাপক ওয়েস্‌লার লিখেছেন—"অপ্রাপ্তবয়স্কদের পক্ষে বাঞ্ছিত এবং শোভনীয় আচরণগুলি কি-কি, তা নির্দিষ্ট করার সঙ্গে সঙ্গে কোন্ কোন্ অবাঞ্ছিত বা গর্হিত আচরণ সংস্কারযোগ্য বা পরিমার্জন-সাপেক্ষ তা স্থির করতে হবে। কোন্ ধরনের অবাঞ্ছিত আচরণগুলি প্রতিবিধানের অভাবে প্রশ্রয় পেলে ক্রমশ উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবে পরিণত হতে পারে এবং সমাজ-শৃঙ্খলাকে বিপর্যস্ত করতে পারে, তা নিশ্চিতরূপে জানতে হবে। সর্বোপরি, আচরণ সংস্কারের প্রতিটি পদ্ধতির উপকারিতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে হবে যাতে উপকারের প্রচেষ্টার ভুলে ওদের কোনো অপকার না হয়।" এই প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশান্যাল প্রোবেশন এ্যাসোসিয়েশন কতকগুলি প্রগতিশীল প্রস্তাব পেশ করেছেন। এঁদের প্রস্তাব অনুযায়ী, সেই সব অপ্রাপ্তবয়স্ককে বিশেষ আদালতের সাহায্যে আচরণ সংস্কারের বিধি-নির্দেশ দেওয়া হবে : (১) যার উপজীবিকা, আচরণ, পরিবেশ অথবা সংসর্গ তার ভবিষ্যতের পক্ষে অকল্যাণকর বা স্বাচ্ছন্দ্যের পক্ষে প্রতিকূল প্রমাণিত হবে। (২) যার মধ্যে পালিয়ে-যাওয়া বা নিরুদ্দেশ হওয়ার স্বভাব এবং পিতামাতা বা অভিভাবকদের অনুশাসন উপেক্ষা করার স্বভাব দেখা যাবে। (৩) যে তার

বয়সের উপযোগী আইনানুগ শিক্ষাগ্রহণে বিমুখ হবে, বিদ্যালয়ের শান্তি বিঘ্নিত করবে, অথবা অসদুদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ে নিয়মিত অনুপস্থিত হবে। এবং (৪) যে তার দেশের, সমাজের, বা সংবিধানের স্বীকৃত সংস্থার বিধি-নির্দেশ স্বীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী নিয়মিত ভঙ্গ করবে।

অপ্রাপ্তবয়স্কদের মূলতঃ দুটি উদ্দেশ্যে অভিযুক্ত করা হয়—প্রথমতঃ যে-কোনো বেআইনী বা প্রশাসনের প্রতিবন্ধক কাজ করার স্পৃহাকে সমূলে উৎপাটন করা, এবং দ্বিতীয়তঃ ভাবীকালের অপরাধীর সংখ্যা হ্রাস করা। বাস্তব ক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্য দুটি সম্পূর্ণ সফল না হলেও যুক্তির দিক থেকে উদ্দেশ্য দুটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ। অধুনাকালের দণ্ড-বিধির মধ্যেও ঐ দুটি উদ্দেশ্যের প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে, গুরুতর অপরাধে অপরাধীকে এমনই দণ্ড দেওয়া হয় যাতে ভবিষ্যতে সে ঐ জঘন্য কাজের পুনরাবৃত্তি না করে অথবা পুনরাবৃত্তির সুযোগ না পায় এবং ঐ দণ্ডভোগের দৃষ্টান্তে অন্যের মধ্যেও যাতে জঘন্য অপরাধের স্পৃহা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। অপ্রাপ্তবয়স্কদের বিধি-বহির্ভূত এবং গর্হিত আচরণগুলিকে সংস্কৃত পরিমার্জিত করে তাদের সুস্থ সমাজ-জীবন যাত্রার উদ্দেশ্যেই তাদের বিশেষ আদালতে অভিযুক্ত করা হয় এবং ঐ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়েই বিশেষ-আদালত বিধি-নির্দেশ দিয়ে থাকেন। সুতরাং ঐ উদ্দেশ্যকে সফল করে তুলতে হলে বিধি-বহির্ভূত ও গর্হিত আচরণের সংজ্ঞা এবং বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষ প্রয়োজন। প্রসঙ্গক্রমে কয়েকটি প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে আসে ঃ

ঠিক কি ধরনের গর্হিত কাজে লিপ্ত হলে কোন্ ছেলেকে বা মেয়েকে বিশেষ আদালতে অভিযুক্ত করা উচিত? পারিবারিক পরিবেশের উচ্ছৃঙ্খলতা বা বিশৃঙ্খলতায় বিরক্ত বা উত্যক্ত হয়ে যদি কোনো ছেলে বা মেয়ের মধ্যে নিরুদ্দেশ হওয়ার প্রবণতা দেখা দেয় তা হলে সে কি আচরণ-সংস্কারের জন্যে আদালতে অভিযুক্ত হবে? শাসনের ছলে নিপীড়নের প্রতিক্রিয়ার ফলে যদি অল্পবয়স্কদের মধ্যে আক্রোশের অভিব্যক্তিতে মাত্রাধিক্য দেখা যায় বা অসংযত আবেগের বন্য প্রকৃতির অভিব্যক্তি দেখা যায় তাহলে এরা কি বিশেষ আদালতে অভিযুক্ত হবে?

পারিবারিক কুসংস্কার, নির্মম শাসন, সুদীর্ঘ অভাব-অনটনের ঘাত-প্রতিঘাত, নির্ভাক ও স্বাবলম্বী হওয়ার পক্ষে প্রতিকূল পরিবেশ, ইত্যাদির সঙ্গে আপোস না-করতে পেরে যদি কোনো ছেলে বা মেয়ে অভিভাবক বা গুরুজনদের বিরুদ্ধাচরণ করে বা অবমাননা করে তাহলে তার আচরণকে কি গর্হিত বা অন্যায় আখ্যা দিয়ে অভিযুক্ত করা যাবে? বিরাট একান্নবর্তী পরিবারের অভিভাবকদের দূরদৃষ্টির অভাবে অথবা অসতর্কতা বা অবহেলার ফলে যদি কোনো অজ্ঞ কিশোরী কোনো চতুর কুচক্রীর পাল্লায় পড়ে কলঙ্কিত হয় তাহলে তাকেও কি অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরাধী হিসাবে অভিযুক্ত করা হবে?

যদি ধরে নেওয়া হয় যে উপরোক্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই ওরা অভিযুক্ত হবে এবং বিশেষ আদালতের বিচার অনুসারে দণ্ডভোগ করবে তাহলে জিজ্ঞাস্য হবে—এই দৃষ্টান্ত অন্যান্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে তার প্রভাবে কি তাদের অপরাধস্পৃহা অঙ্কুরে বিনষ্ট হবে? এখনো পর্যন্ত এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় নি। প্রসঙ্গক্রমে, কতকগুলি বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির কথা মনে আসে যেগুলির বিষময় প্রভাবে অপ্রাপ্তবয়স্কদের মনে, আচরণে ও স্বভাবে অপরাধস্পৃহা প্রশ্রয় পায়। যেমন—অবিন্যস্ত পারিবারিক পরিবেশ, অভিভাবকদের সতর্ক দৃষ্টির শৈথিল্য বা আধিক্য, পারিবারিক উচ্ছৃঙ্খলতা, চরম দারিদ্র্য, এবং অস্বাস্থ্যকর পল্লী পরিবেশ। দেখা গেছে, অস্বাস্থ্যকর পল্লী পরিবেশে নিদারুণ অর্থাভাবে ক্লিষ্ট পরিবারগুলি পশুপক্ষীর বাসস্থানের মতো ছাউনির মধ্যে বাস করে, নানা অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করে, এবং জীবিকা অর্জনের জন্যে স্বভাব-অপরাধীদের উচ্ছৃঙ্খলতার উপচার ও উপকরণ জুগিয়ে থাকে, অথবা তাদের গর্হিত এবং নীতি-বিরোধী চিত্ত বিনোদনের আয়োজন করে থাকে। যে বয়সের ছেলেমেয়েরা অনুকরণপ্রিয় হয়, সহজে প্রলুব্ধ হয়, ভালমন্দ বিচার করতে পারে না, তাদের পক্ষে ঐ ধরনের অস্বাস্থ্যকর পল্লী-পরিবেশ যে কত ক্ষতিকর তা সহজেই অনুমেয়।

প্রকৃত পরিচর্যার অভাবে ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে অনেক সময়ে

কতকগুলি বদ অভ্যাস দেখা দেয়, যেমন—একমনে আঙ্গুল চোষা, দাঁত দিয়ে নখ কাটা, খিটখিটে বা বদমেজাজী হওয়া, শয্যামূত্রের, স্বমেহনের অভ্যাসে অভ্যস্ত হওয়া ইত্যাদি। এই প্রকৃতির ছেলেমেয়েদের মধ্যে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেত্র বিশেষে নিঃসঙ্গপ্রিয়তা, দুশ্চিন্তাচ্ছন্নতা, পরিবারবিরোধী বা সমাজবিরোধী মনোভাব এবং কাল্পনিক অপরাধবোধ বিশেষভাবে প্রকট হয়ে ওঠে। এই ধরনের ব্যক্তিমানসের বিকাশগত সমস্যাগুলির যদি সময়মত সমাধান না করা হয় বা যথাযোগ্য আচরণ-সংস্কারের ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে ভাবীকালে এদের বেয়াড়াপনাতেই সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট হয়, পল্লীবাসী উত্যক্ত হয়ে ওঠে, এবং বিশেষ বিশেষ পরিবারকে বিব্রত হতে হয়। এই প্রকৃতির ছেলেমেয়েরা চরম আলস্যকে আঁকড়ে ধরে কর্মবিমুখ হয়ে ওঠে এবং ছলে-বলে-কৌশলে নীতিবিরোধী পদ্ধতিতে অর্থোপার্জনের চেষ্টা করে। এরা অত্যন্ত বদখেয়ালী, কলহপ্রিয় এবং অবাধ্যতার প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠে। এদের জীবনের এই ভয়াবহ সন্ধিক্ষণে এরা আত্মীয়, পরিজন ও প্রতিবেশীদের স্নেহ-সান্নিধ্যকে অবজ্ঞা করে এবং চতুর স্বভাব-অপরাধীদের প্রলোভনে লালসাভরা জীবনের প্রতি একটা দুর্বার আকর্ষণ অনুভব করতে থাকে। এদের মধ্যে ঘটনাচক্রে অনেকেই স্বভাব-অপরাধীদের 'নয়া ভাইয়া' রূপে ছিনতাই, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, খুনজখম, ব্যাভিচার বা বলাৎকারের মূল অপরাধী অথবা সহযোগী অপরাধী হিসাবে পুলিসের হাতে ধরা পড়ে এবং দণ্ডবিধির বিশেষ ধারায় অভিযুক্ত হয়। অভিযুক্ত হওয়ার পর উপযুক্ত প্রতিবিধানের সুযোগ না পেলে এদের সুস্থ সমাজ-জীবনের সম্ভাবনা সমূলে বিনষ্ট হয়।

প্রতিটি ছেলেমেয়ের নিজস্ব ধাত, মনের বিচিত্র গতি এবং পরিবেশের বিশেষ বিশেষ প্রভাবগুলি ঘটনাচক্রে এমনভাবে একত্রে সন্নিবেশিত হয় যে তাদের প্রত্যেকের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ প্রণোদনার (motive) সৃষ্টি হয়ে থাকে। ঐ প্রণোদনাগুলিই তাদের প্রত্যেকের জীবনের গতিকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এবং সেই নিয়ন্ত্রী প্রণোদনা-গুলিই পরিবেশের বিভিন্ন পরিস্থিতির মোকাবিলায় তাদের জীবনের

সাফল্য অথবা অসাফল্য, আশা অথবা হতাশা, এবং পাওয়ার আনন্দ অথবা না পাওয়ার বেদনা, ক্ষেত্রবিশেষে তাদের ব্যক্তিগত জীবনকে হয় সৎপথে অথবা বিপথে পরিচালিত করে থাকে। প্রকৃতি, পরিবেশ এবং ঘটনাচক্রের তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাবগুলি কোনো ছেলেকে বা কোনো মেয়েকে ঠিক কোন্ পথে নিয়ে যাবেই সে কথা আচরণ-বিজ্ঞানীরা এখনো দৃঢ়তার সঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম হননি। সচরাচর ছেলে-মেয়েদের সহজাত প্রকৃতির ওপর পরিবেশের প্রভাবে তাদের মনে অপরাধমূলক কাজে সক্রিয় হওয়ার বাসনা আসে না, কিন্তু যদি আসে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। অপরাধমূলক কার্যের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠা কতকগুলি ঘটনার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। সেই জন্যে, স্বাভাবিক আচরণসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যভেদে যেমন নানা বৈশিষ্ট্য ও আগ্রহ দেখা দেয়, তেমনি নীতিবিরোধী ও গর্হিত আচরণশীল ছেলেমেয়েদের মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের অপরাধের প্রতি আগ্রহ ও সেগুলিতে পারদর্শিতা দেখা যায়। আইনের মানদণ্ডে এদের পরিচয় অভিন্ন হলেও দৈহিক ও মানসিক বিশেষত্বে এরা প্রকৃতপক্ষে ভিন্নতার স্বাক্ষর বহন করে থাকে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দিক থেকে এদের মধ্যে ভিন্নতা সুস্পষ্ট হলেও অপরাধস্পৃহার জন্যে এদের জীবনে কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রভাবী উপাদানের সমন্বয় অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপরাধের প্রকৃতি ও প্রভাবী উপাদানগুলির বিশেষ বিশেষ সমন্বয়ের মধ্যে একটি যোগসূত্র দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য প্রতি-ক্ষেত্রেই একাধিক প্রভাবী উপাদান ঘটনাচক্রে সন্নিবিষ্ট হয়ে থাকে। স্বাতন্ত্র্যভেদে কি ভাবে পরিবেশের বিভিন্ন প্রভাবী ঘটনাগুলি ব্যক্তি-মানসের বিকৃতি ঘটায় সেই গূঢ় রহস্য সম্পর্কে ডক্টর উইলিয়ম হীলি এবং অধ্যাপক সিরিল বার্ট যে সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন সেগুলির ভিত্তিতেই সম্প্রতিকালের অকাল-অপরাধীদের নিদানতত্ত্ব সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। এঁদের মতে—অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের জীবনের ইতিহাসে বিশেষভাবে তিনশ্রেণীর প্রভাবী উপাদানের সমন্বয় দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, তাদের দৈহিক ও মানসিক সহজাত

বৈশিষ্ট্যগুলি ; দ্বিতীয়তঃ, পরিচর্যার প্রভাবে গড়ে-ওঠা তাদের মনের বিচিত্র গতি ; এবং তৃতীয়তঃ, তাদের পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন ঘটনাচক্র। উক্ত তিন শ্রেণীর প্রভাবী উপাদানের মধ্যে ক্রমাগত মিথস্ক্রিয়ার (interaction) সময়ে তাদের ভাবাবেগের সহজ প্রকাশ যদি বারংবার বিপর্যস্ত হয় বা দীর্ঘদিন নিরুদ্ধ হয়ে থাকে তাহলে তাদের ব্যক্তিমানসের গঠনে বিকৃতি আসে এবং তারা যে-কোনো সহজলভ্য পথে এমন একটি পরিবেশের আশ্রয় নিতে চায় যেখানে তাদের প্রণোদনাগুলি প্রশমিত হবে এবং তাদের ব্যক্তিসত্তা অবহেলিত বা অপমানিত হবে না। ঐ সহজলভ্য পথ বা পন্থার দুর্বার আকর্ষণেই তারা ঘর ছাড়ে, পরিবেশকে এড়িয়ে চলে, পারিবারিক অনুশাসনকে তাচ্ছিল্য করে, অভিভাবকদের কর্তৃত্ব ও সম্ভ্রমকে ধুলায় মিশিয়ে দেয় এবং যে সমস্ত পথ সাধারণে এড়িয়ে চলে, ওরা সেই সব পথের পথিক হয় বা যে সমস্ত কাজ সমাজ ও সংস্কৃতিতে অবাঞ্ছনীয় সেই সব কাজেই সক্রিয় হয়ে ওঠে। এদের ব্যক্তিমানসের বিকৃতির মূল কারণ বিদ্বেষ, এদের প্রতিটি কাজের অন্তরালে থাকে আক্রোশের প্রণোদনা এবং নিজেদের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে এরা বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে পরগাছার মত নিজেদের যুক্ত করে রাখে।

ছোটদের মনে অপরাধ-প্রবণতার লক্ষণ দেখা যাওয়ার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক ক্লিফোর্ড শ এবং তাঁর সহযোগী গবেষকগণ দেখতে পেয়েছিলেন যে অস্বাস্থ্যকর পল্লী-পরিবেশের পরিচর্যায় ছোট ছেলেমেয়েরা স্বভাবতঃই অপরাধমূলক আচরণের শিক্ষা পায় কারণ ঐ পরিবেশে অপরাধকে গর্হিত বা ঘৃণ্য মনে হয় না। তাঁদের মতে প্রত্যেক শহরে বা পল্লীতে অনুসন্ধান করলে ঐ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সন্ধান পাওয়া যাবে এবং উক্ত পরিবেশের আবহাওয়া যুগে যুগে ছোট ছেলেমেয়েদের বিপথগামী হওয়ার দীক্ষা দিয়ে থাকে। এই জন্যে সব সময়েই স্বভাব-অপরাধীরা কিছু 'নয়া ভাইয়া' পায় এবং এই নবাগতরাই ভবিষ্যতে স্বভাব অপরাধী হয়ে ওঠে। ক্লিফোর্ড শ যেমন অস্বাস্থ্যকর পল্লীপরিবেশের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন, অধ্যাপক

এডুইন সাদারল্যাণ্ড ঠিক তেমনিভাবে সমগ্র সমাজের পরিবেশ-বৈষম্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অধ্যাপক সাদারল্যাণ্ডের মতে, সমাজে ও সভ্যতায় যখন সঙ্কট দেখা দেয় তখন মানুষের জীবনধারণের উপযোগী পরিবেশে শৃঙ্খলার চেয়ে বিশৃঙ্খলার আধিক্য প্রকাশ পায়, যার ফলে জনজীবনে আদর্শচ্যুত হবার যথেষ্ট ঘটনা ঘটে। এই ঘটনাচক্রে যারা জড়িয়ে পড়ে, যাদের জীবন বিপর্যস্ত হয়, যারা একবার পথভ্রষ্ট হয়ে আর ঠিক পথে ফিরে আসতে পারে না, তারাই পাকেচক্রে স্বভাব-অপরাধী হয়ে ওঠে এবং তাদের প্রভাবেই অপরাধের বীজ শিশুদের মনে সংক্রামিত হয়ে থাকে। নিষিদ্ধ পথে যাওয়ার, নিষিদ্ধ কাজ করার, অথবা গোপনে বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করবার এক অদম্য কৌতূহল অনেক সময়ে ছোটদের মনে প্রবল হয়ে ওঠার প্রধান কারণ—ছোটদের সামনে বড়দের নিষেধ লঙ্ঘন করতে দেখা। এই কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে এরা যখন সুযোগ খোঁজে তখনই এরা স্বভাব-অপরাধীদের শিকার হয় এবং নিছক কৌতূহল নিবৃত্তির বশে নিষিদ্ধ কাজ করতে গিয়ে এমন লোভনীয় ঘটনাচক্রে তারা জাড়িয়ে পড়ে যার নাগপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করার ক্ষমতা তাদের থাকে না। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক ভিয়েরর্নস্টেইন এবং অধ্যাপক লেন্‌জ বলেছেন যে অল্পবয়সে যারা অপরাধ করে থাকে তাদের ভিতর এক শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের মধ্যে নিষিদ্ধ কাজ করবার একটা প্রণোদনা তাদের বিপথগামী করে তোলে এবং অন্য শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা নিছক পরিবেশের পাকচক্রে অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। প্রথম শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের ধাত তাদের অপরাধী করে তোলে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের পরিবেশের দুর্ঘটনা তাদের দুর্ভাগ্যকে গড়ে তোলে। বিশিষ্ট মার্কিন অপরাধবিজ্ঞানী লিণ্ডস্মিথ এই দ্বিতীয় শ্রেণীকে সমাজসৃষ্ট অপরাধী আখ্যা দিয়েছেন। যে-সব ছেলেমেয়েদের ধাতে অপরাধের স্পৃহা কোনো অজ্ঞাত কারণে এসে যায় তাদের ব্যক্তিমানস সমীক্ষা করে রবার্ট লিণ্ডনার তাদের মনের গতি বৈচিত্র্যের রহস্য বহুলাংশে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এই সব ছেলেমেয়েদের নির্জন মনের কোনো এক অতীব

সক্রিয় অথচ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত প্রণোদনা তাদের এই ধাতটি গড়ে তোলে। তাঁর মতে, যে সব ছেলেমেয়েদের মন সবল তারা নির্জ্ঞান মনের তীব্র প্রণোদনাকে যে কোনো উপায়ে সামলে নেয় অথবা পরোক্ষভাবে সেই প্রণোদনাকে তৃপ্ত রাখে বা শান্ত রাখে। কিন্তু যাদের মন দুর্বল তারা সামলাতে পারে না এবং তাদের মনের গতি সব সময়েই ঐ প্রণোদনার প্রভাবে পরিচালিত হয় বলেই তাদের ধাতে নির্জ্ঞান মনের আদিম ও স্থূল ভাব প্রত্যক্ষীভূত হয়—(যখন প্রত্যক্ষীভূত হয়) তখন তারা যে কাজ করে সেগুলি রুচিবর্জিত, নীতিবিরোধী, এবং তারা বিপথগামী হিসাবে প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং এদের মনকে সবল না করতে পারলে এদের মতিগতি বদলানো যেতে পারে না।

অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণার সিদ্ধান্ত অনুধাবন করলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে বিপথগামী হওয়ার কারণগুলির ভিত্তিতে ওদের নিম্নলিখিত চারিটি বিভাগে বিন্যস্ত করতে পারি—প্রথমতঃ, যারা সম্পূর্ণ নিজেদের অজ্ঞাতে নিছক দৈবদুর্বিপাকে খুব জঘন্য অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে—তাদের জীবনে এই ভাবে জড়িয়ে-পড়া সত্যিই একটি ব্যতিক্রম। দ্বিতীয়তঃ,যারা দুর্ভাগ্যক্রমে এমন পরিবারে জন্মেছে এবং এমন পরিবেশে মানুষ হয়েছে যেখানে অপরাধমূলক কাজগুলি উপজীবিকার নামান্তর। এই আবহাওয়ায় প্রতিপালিত ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিমানসের গতি-প্রকৃতিতে উচ্ছৃঙ্খলতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে থাকার ফলে এদের বিবেকের কাছে অন্যায়, গর্হিত এবং নীতিবিরোধী কাজগুলি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং সহজগ্রাহ্য হিসাবে সমাদৃত হয়ে থাকে। কারণ এদের জীবনে অপরাধ ব্যতিক্রমের পর্যায়ে পড়ে না। তৃতীয়তঃ, মানসিক অসুস্থতার প্রভাবে যারা নির্জ্ঞান মনের কোনো অজ্ঞাত প্রণোদনার তাগিদে সমাজ ও সংস্কৃতিবিরোধী কাজ করে থাকে। এদের অপরাধগুলির চরিত্রে এমন একটি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায় যার সাহায্যে অভিজ্ঞরা বুঝতে পারেন যে এটা তাদের মানসিক অসুস্থতার লক্ষণ। মানসিক সুস্থতা ফিরে পেলে এরা আর অপরাধমূলক কাজ করতে পারে না।

চতুর্থতঃ, দৈহিক অথবা মানসিক শক্তিতে অসমর্থ, বিকলাঙ্গ অথবা পঙ্গু ছেলেমেয়েদের মধ্যে যারা অত্যধিক অবহেলা এবং অনাদরের নিপীড়ন সহ্য করতে না পেরে অথবা পরিত্যক্ত হওয়ার পর স্বভাব-অপরাধীদের আশ্রয়ে জীবন ধারণ করতে বাধ্য হয়। এরা যেমন অপরাধীদের উপর নির্ভরশীল হয়, তেমনি অপরাধীরাও বিভিন্ন গর্হিত কাজে এদের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। উপরোক্ত চারটি বিভাগে অপ্রাপ্তবয়স্কদের অপরাধী হয়ে ওঠার কারণগুলিকে বিন্যাস করার অভিমতটি সমর্থনযোগ্য হলেও সব সময়েই আমাদের মনে রাখা উচিত যে প্রতি ক্ষেত্রেই একাধিক কারণের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া এদের ব্যক্তিমানসের গতি-প্রকৃতিতে বিকৃতি ঘটিয়ে থাকে।

অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের আচরণ সংস্কারের উদ্দেশ্যে বিশেষ আদালতের প্রয়োজনীয়তা সর্বজনস্বীকৃত। এই ধরনের আদালতের সংখ্যা আমাদের দেশে প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। প্রয়োজন অনুযায়ী এই আদালত স্থাপন করা এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার দায়িত্ব শাসন-কর্তৃপক্ষের ; কারণ, সমাজকে তথা সমগ্র দেশকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রশাসনিক দায়িত্ব দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ তাঁদের হাতেই তুলে দিয়েছেন—সেই দিক থেকে যে-সব ব্যাপারে ছেলেমেয়েদের অভিভাবকরা প্রকৃতপক্ষে অক্ষম, আশা করা যায়, সেই সব ব্যাপারে শাসন-কর্তৃপক্ষ অভিভাবকদের প্রতিভূরূপেই কাজ করবেন। শাসন-কর্তৃপক্ষের ওপর এই দায়িত্ব ন্যস্ত থাকার সঙ্গে আইন এবং আদালতের ব্যবস্থা-পত্র এমন হওয়া উচিত যে আচরণ-সংস্কার কেন্দ্রে ছেলেমেয়েরা যেন মনোরম, সুশৃঙ্খল ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকার সুযোগ পায়। কারণ, সব সময়েই মনে রাখতে হবে যে বিপথগামী হয়ে ওঠার জন্যে ছেলেমেয়েদের নীতিগত বা আইনগতভাবে দায়ী করা চলে না। এই কারণেই আচরণ-সংস্কার কেন্দ্রে প্রতিশোধমূলক শাস্তির প্রচলন নেই। এই ধরনের সংস্কারালয়ে ছেলেমেয়েদের সাধারণ কয়েদীদের মত আটক রাখা হয় না, তার পরিবর্তে অভিভাবকরা সুনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে যেমন ছেলেমেয়েদের সুষম ব্যক্তিমানস গঠনের

চেষ্টা করেন, অনুরূপ একটি পরিবেশের মধ্যেই তাদের রাখার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। সংস্কারালয়ের কঠোর অনুশাসন বিপথগামী ছেলেমেয়েদের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই প্রবর্তিত হয়ে থাকে। এখানে ছেলেমেয়েদের এনে রাখবার মুখ্য উদ্দেশ্য তাদের জীবনের অপূর্ণ চাহিদা, যত শূন্যস্থান, যত ক্ষোভ, রাগ, দুঃখ, ইত্যাদিকে জানা, বোঝা, এবং সেইগুলির বিষময় প্রভাব থেকে তাদের মুক্ত করে সুস্থ সমাজ-জীবনে পুনর্বাসিত করা। এখানে আবাসিক ছেলেমেয়েদের গৃহবিমুখ এবং সমাজবিমুখ মনোভাবকে সুবিন্যস্ত ও সংশোধিত করে আবার গৃহমুখী ও সমাজানুগ করে তোলার সব ব্যবস্থাই থাকা বাঞ্ছনীয়।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে অপ্রাপ্তবয়স্কদের অপরাধ-স্পৃহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করার পর বিধিনির্দেশ দেওয়াই ওদের জন্য বিশেষ আদালতের কর্মপদ্ধতির বিশেষত্ব হওয়া উচিত। এই আদালত শুধু প্রমাণ ও যুক্তিতর্কের ভিত্তিতে বিচার করে রায় দিলে সব দিক থেকে কর্তব্যচ্যুত হবে। এই আদালতকে বিচারের সময় অভিযুক্তের মনের চাহিদাগুলিকে বিশেষভাবে জানতে হবে, প্রভাবী প্রণোদনাগুলিকে বুঝতে হবে, পরিবেশের কি কি দুষ্ট প্রভাব অভিযুক্তের মনকে, চিন্তাধারাকে বিপথগামী করে তুলেছে তার বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করতে হবে—নচেৎ আদালতের পক্ষে অভিযুক্তের আচরণ সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় যথোপযুক্ত বিধিনির্দেশ দেওয়া সম্ভব হতে পারে না। কারণ, এই বিধিনির্দেশের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো আয়ত্তাধীন পরিবেশে নিয়ত পর্যবেক্ষণাধীন অবস্থায় আপ্রাপ্তবয়স্কদের চিন্তাধারার সুনিয়ন্ত্রণ। সুনিয়ন্ত্রিত চিন্তাধারার প্রভাবে পুনরায় যাতে ওরা সুপথে চলতে পারে তার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা, উপজীবিকার প্রারম্ভিক অভিজ্ঞতা, এবং নির্দোষ চিত্ত-বিনোদক কার্যাদির বিধিনির্দেশগুলি যেখানে প্রতিপালিত হবে সেই সব আচরণ-সংস্কার কেন্দ্রগুলির ত্রুটি বিচ্যুতির প্রতিবিধানের দিকেও আদালতের সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। এর জন্য আদালত থেকে প্রতিটি অনুমোদিত আচরণ-সংস্কার কেন্দ্রের প্রশাসনিক সুব্যবস্থার ভার মনোবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী এবং শিক্ষাবিজ্ঞানীদের

দ্বারা গঠিত একটি ক্ষমতাশালী কমিটির উপর দেওয়া সঙ্গত। বর্তমানে যে ভাবে আচরণ-সংস্কার কেন্দ্রগুলি পরিচালিত হয়ে থাকে তার সঙ্গে পরিচিত হলে সহজেই বোঝা যায় যে এখন সেখানে যে-সব অপ্রাপ্ত-বয়স্করা আবাসিক রূপে রয়েছে তাদের মধ্যে ভবিষ্যতে কোনো স্বপ্ন নেই, তারা সেখান থেকে পালিয়ে যেতেই চায়। গ্রাসাচ্ছাদনের এবং রাত্রি-বাসের সুবন্দোবস্ত থাকলেও অতীতের সব কলঙ্ক মুক্ত হয়ে আবার সুস্থ সমাজ-জীবন যাপন করে সুনাগরিকের জীবন-স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে পাবার প্রাণবন্ত প্রচেষ্টার অভাব ঐ কেন্দ্রগুলির আবহাওয়ায় সুপরিস্ফুট। যদি ঐ সব কেন্দ্রের কাগজপত্র দেখেন, ছবি তোলেন, তাহলে দেখতে পাবেন বা আপনার মনে হবে—সব ব্যবস্থাই করা আছে ; কিন্তু যদি আবাসিকদের জীবনের গতিপথের সন্ধান গোপনে নেন, তাহলে দেখবেন যে তাদের জীবনের মূল বৃহত্তর সমাজ-জীবনের পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো এক অজ্ঞাত ও অনভিপ্রেত পরিবেশের দিকে এগিয়ে চলেছে। এই সব আবাসিকদের জীবন, হয় শুকিয়ে যাবে, আর না হয় এরা বেঁচে থাকবে এক অবাঞ্ছিত জগতের পরিবেশে, সেখানকার বাসিন্দা হয়ে। ছবির মানুষকে যতই প্রাণবন্ত মনে হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে সে যেমন নিষ্প্রাণ, সমাজ-জীবনে অচল, ঠিক সেই রকম এখনো পর্যন্ত ঐ আচরণ-সংস্কার কেন্দ্রগুলি এক মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে নিষ্প্রাণ সত্তা নিয়েই বিরাজ করছে। কিভাবে এই কেন্দ্রগুলিতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করা যায়, তার পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য বিজ্ঞানীবৃন্দের সাহায্য প্রশাসকদের নিতেই হবে। নিষ্প্রাণ কর্মসূচীর অন্তরালে যেটুকু প্রশাসনীক অহমিকা এখনো প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করছে, আশা করা যায়, বৃহত্তর কল্যাণের কামনায় তা অচিরেই দূর হয়ে যাবে।

একটু সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে যদি অনুসন্ধান করা যায়, তাহলে প্রতি শহরের এবং শহরতলীর প্রায় প্রতিটি পল্লীতেই কিছু অল্পবয়সী ছেলে মেয়ের সন্ধান পাওয়া যাবে যারা অভিভাবকদের অক্ষমতার অথবা নির্লিপ্ততার সুযোগ নিয়ে নিজেদের খেয়ালের উজানে ধেয়ে চলেছে।

নিজেদের ভবিষ্যতের বিষময় পরিণাম সম্পর্কে এদের কোনো উপলব্ধি নেই। উদ্দেশ্যবিহীন হয়ে, যেখানে-সেখানে যখন-তখন ঘুরে বেড়াবার সময়ে এদের গতিবিধি অনেক ক্ষেত্রে সন্দেহজনক মনে হওয়ায় এরা পুলিসের হাতে ধরা পড়ে। এরা নিজেদের পরিচয় গোপন রেখে কপর্দকহীন অবস্থায় ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়ায়, মাঠে-ঘাটে, পথে, স্টেশনে বা ধর্মশালায় রাত কাটায়। এদের মধ্যে কেউ কেউ স্বভাব-অপরাধীদের আড্ডায় আশ্রয় পায়, এবং খাওয়া-পরার বিনিময়ে ছোট-খাটো ফরমাস খাটতে খাটতে ক্রমশ তাদের বিশ্বস্ত হয়ে ওঠে। এই সময়ে এরা জুয়া খেলতে, নেশা করতে ও স্বভাব-অপরাধীদের পাল্লায় পড়ে চুরি করতে শেখে। সাধারণতঃ, মোটরগাড়ীর যন্ত্রপাতি খুলে নেওয়ার সময়, সাইকেল নিয়ে পালাবার সময়, দোকান থেকে বা গৃহস্থের বাড়ি থেকে জিনিসপত্র নিয়ে পালাবার সময় অভিজ্ঞতার অভাবে এরা ধরা পড়ে। মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র বে-আইনীভাবে লুকিয়ে রাখা, হত্যা, হত্যার চেষ্টা, ব্যভিচার এবং বলাৎকারের অভিযোগেও এরা অভিযুক্ত হয়ে থাকে। তবে, যে ভাবেই অভিযুক্ত হোক না কেন, এদের মনের কথা জানতে পারলে বোঝা যায় যে এদের প্রত্যেকেরই জীবনের একটি বেদনাদায়ক ইতিহাস থাকে। যার প্রভাবে এরা ক্রমশ বিপথগামী হওয়ার সময়—ঠিক যে অবস্থায় ধরা পড়লে এবং আচরণ সংস্কারের ব্যবস্থা করা হলে এদের জীবনে অসৎ সঙ্গের প্রভাবে সর্বনাশ ঘনিয়ে উঠত না, সেই অবস্থায় ধরা না পড়ে বেয়াড়াপনা যখন এদের স্বভাবে পরিণত হয়ে যায় তখনই এরা ধরা পড়ে। যখন এরা ধরা পড়ে কোনো অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে দণ্ডভোগ করে, তার পরে এরা সমাজে আর কিছুতেই সহজ হতে পারে না অথবা সমাজ বা প্রতিবেশীরা এদের সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু কেন এমন হয়? অথবা কিভাবে চললে ঐ সমস্যার সমাধান হতে পারে? সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা প্রয়োজন।

ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে পরিবেশ-প্রভাবী যে-সমস্ত ঘটনাচক্রে অপরাধস্পৃহা জেগে ওঠে এবং ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে তাদের অপরাধপ্রবণ

করে অথবা স্বভাব-অপরাধী করে তুলতে পারে, সেইগুলির প্রতিবিধান সম্পর্কে সমাজের প্রত্যেকের যে দায়িত্বটুকু আছে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো না কোনো কারণে প্রতিপালিত হয় না। প্রতিপালিত হয় না একথা বলার পক্ষে যুক্তি হলো যে ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে যখনই কোনো আপত্তিকর স্বভাব আমরা লক্ষ্য করি অথবা যখনই অভিভাবক বা শুভাকাঙ্ক্ষীদের শাসনকে উপেক্ষা করে গর্হিত কাজে তাদের লিপ্ত হতে দেখি, তখনই আমরা তাদের বিরত করার জন্য বা তাদের আচরণ-সংস্কারের জন্য তৎপর হয়ে উঠি না। তা ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিভাবকরা নিজেদের অক্ষমতাকে সহজে স্বীকার করে নিয়ে প্রতিবিধানের জন্য খুব বেশি আগ্রহ দেখান না। "এখন ছোট আছে, বোঝে না। পরে, বড় হলে সব ঠিক হয়ে যাবে,"—এই যুক্তির দোহাই দিয়ে অনেকে নিশ্চিন্ত থাকেন। অনেকের ধারণা আছে—অভিভাবকদের সাধ্যে কুলায় না বলেই তাঁরা প্রতিবিধান করতে পারেন না। এই ধারণা সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, কারণ, দেখা গেছে সাধ্যে কুলায় এমন অভিভাবকও ব্যাপারটা গোপন রাখতে চান—আত্মমর্যাদা বা পারিবারিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবার ভয়ে। এমন কি অনেক অভিভাবক বিপথগামী ছেলেমেয়ের পক্ষ নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে কলহে প্রবৃত্ত হন, থানায় গিয়ে মিথ্যা এজাহার দেন। এঁরা বিষয়টির ভাবী বিষময় পরিণাম সম্পর্কে হয় উদাসীন অথবা অজ্ঞ, কিংবা প্রকৃত গলদ কোথায় তা জেনেও উপায়ান্তর না দেখে শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চেষ্টা করেন।

অপ্রাপ্তবয়স্কদের আদালত সম্পর্কে অভিভাবক এবং প্রতিবেশীদের অজ্ঞতা তাঁদের এই বিষয়ের প্রতি ঔদাসীন্যের জন্য অনেকাংশে দায়ী। এই আদালত কি উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত, এর সঙ্গে প্রাপ্তবয়স্কদের আদালতের দণ্ডনীতি ও দণ্ডবিধির পার্থক্য কি, কিভাবে এই আদালতের সাহায্য গ্রহণ করা সম্ভব, ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য সম্পর্কে অধিকাংশ অভিভাবকই অজ্ঞ। তাছাড়া 'আদালত', 'অপরাধী', 'অভিযুক্ত হওয়া', 'দণ্ডভোগ করা', ইত্যাদি শব্দগুলির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্য আমাদের মনে এমনই হেয় ও অবমাননাসূচক ধারণা বদ্ধমূল করে দিয়েছে

যে ঐগুলির সঙ্গে কেউই নিজেদের কোনোমতে জড়াতে চান না। এই বিশেষ আদালত সম্পর্কে উপযুক্ত প্রচার বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের দেশের প্রশাসনযন্ত্র এই প্রচার কার্যে এখনো ধ্যান দেয়নি।

আমাদের দেশে অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য আদালতও আছে এবং প্রশাসন ব্যবস্থার আনুকূল্যে দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অপ্রাপ্তবয়স্কদের আচরণ সংস্কারের জন্য কয়েকটি আবাসিক কেন্দ্রও সক্রিয় আছে। ঐ কেন্দ্রগুলির পরিচালনা-ব্যবস্থায় কতকগুলি 'কিন্তু' জড়িয়ে থাকায় প্রকৃত সমস্যার মোকাবিলায় কেন্দ্রগুলির অবদান এখনো পর্যন্ত খুব নিম্নমানের। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে সেখানে আবাসিক ছেলেমেয়েদের মনের খবর যথাযথভাবে নেওয়ার সুব্যবস্থা নেই এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে আচরণ-সংস্কারের পরিকল্পনাগুলিকে প্রাণবন্ত করার স্বাধীনতা ও সুযোগ-সুবিধা কেন্দ্রের কর্মীদের যথেষ্ট পরিমাণে নেই। এই সব কেন্দ্রগুলির পক্ষে সর্বতোভাবে উপযুক্ত কোনো স্থায়ী প্রকল্প প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রশাসন-কর্তৃপক্ষ এখনো পর্যন্ত মনোবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, এবং শিক্ষাবিজ্ঞানীদের নিয়ে সক্রিয় উপদেষ্টাসংস্থা গঠন করে উঠতে পারেননি। যে কোনো কারণেই হোক, এখনো পর্যন্ত এই কেন্দ্রগুলিতে অপ্রাপ্তবয়স্কদের ব্যক্তিমানসের প্রকৃত সমস্যা ও চাহিদা বুঝে স্বতন্ত্রীকরণের কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে যে সব ছেলেমেয়ের মধ্যে আচরণ সংস্কারের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে তারা উপযুক্ত সুযোগসুবিধা পাচ্ছে না এবং যারা প্রায় স্বভাব-অপরাধী হয়ে গেছে তাদের সংসর্গ-দোষকেও এড়িয়ে-চলা সম্ভব হচ্ছে না। এই কারণগুলি আচরণ-সংস্কারের ও সুস্থ সমাজ-জীবনে প্রত্যাবর্তনের পথে উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধক।

অপ্রাপ্তবয়স্কদের আচরণ সম্পর্কীয় অভিযোগের বিচার করবার জন্যে বিশেষ আদালতের কর্মপদ্ধতির পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। এই পুনর্বিন্যাসের মূল উদ্দেশ্য হবে ঐ আদালত সম্পর্কে সমাজে প্রচলিত বিরূপ মনোভাবকে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করা। এই জন্য প্রশাসন কর্তৃপক্ষ

বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত মনোবিজ্ঞান, ও শিক্ষাবিজ্ঞানের বিভাগীয় প্রধানদের পরামর্শ গ্রহণ করলে উপকৃত হবেন। কারণ, এই আদালতের নীতি, বিধান, এবং বিধিনির্দেশ পদ্ধতিগুলি মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিতে এবং শিক্ষাবিজ্ঞানের সূত্র অনুসরণে প্রণয়ন করতে হবে। এখনো পর্যন্ত পুলিসের হাতে ধরা পড়লে তবেই অপ্রাপ্তবয়স্করা আদালতে অভিযুক্ত হয়—পরিণামে, আমাদের মনে 'পুলিস', 'থানা', 'হাজত' বা 'ফাটক', 'আসামী', 'জেল-খাটা' ইত্যাদি শব্দগুলির ভাবমূর্তি সমগ্র বিষয়টিকে জটিল বা কঠিন করে তোলে। তা ছাড়া অতীতকাল থেকে অপরাধীর দণ্ড সম্পর্কে সমাজে যে সব ভয়াবহ স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে সেগুলিকে নস্যাৎ করে দণ্ডের অন্য কোনো ব্যাখ্যাও আমাদের মনে স্থান পায় না। জনসাধারণের মন থেকে এই বদ্ধমূল ধারণাগুলিকে দূর করতে গেলে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের আদালত এবং আচরণ-সংস্কার কেন্দ্রগুলির উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতির প্রচার বিশেষ প্রয়োজন। বিষয়টির সৎ ও মহৎ উদ্দেশ্য প্রত্যেকের কাছে পরিস্ফুট হয়ে উঠলে বিব্রত অভি-ভাবকেরা এবং পল্লীবাসীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই বিশেষ আদালতের সাহায্য নেবেন—ফলে পুলিসের হাতে ধরা না পড়া পর্যন্ত ব্যাপারটি অবহেলিত থাকবে না।

এখনো পর্যন্ত আমাদের দেশে ঐ বিশেষ আদালতের অনুমোদিত কোনো 'প্রাথমিক আচরণ-সংস্কার সংস্থা' বা 'অভিভাবক উপদেশনা কেন্দ্র' নেই। এই কারণে অভিভাবকেরা প্রয়োজনমত প্রকৃত উপদেশ পান না এবং ছেলেমেয়েদের আচরণের স্বাভাবিক গতিপ্রকৃতি ব্যাহত বা বিকৃত হতে দেখলে যথাযথ প্রতিবিধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন না। দৈহিক বা মানসিক নিপীড়নমূলক শাস্তির বিধান দেওয়ার জন্য বিশেষ আদালতের কোনো প্রয়োজন নেই। প্রাক্-কৈশোর, কৈশোর বা কৈশোরোত্তর কালের অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্ত করে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনের আনন্দ উপভোগ করবার উপযুক্ত করে তোলার মধ্যেই বিশেষ আদালতের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতার মূল প্রোথিত

রয়েছে। শুধু বিপথগামীদের জন্যে নয়, দেশের প্রতিটি অপ্রাপ্ত-বয়স্কের মানসিক সুস্থতা অক্ষুণ্ণ রাখার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই এই বিষয়ের প্রকল্প প্রণয়ন করতে হবে। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের উদ্যোগ এবং প্রতিটি নাগরিকের সহযোগিতার উপর এই প্রকল্পের সাফল্য নির্ভরশীল—নচেৎ আড়ম্বর যতই হোক না কেন, সমস্যার মোকাবিলায় সাফল্যের সম্ভাবনাতে অনিশ্চয়তা থাকবেই।

———

বিশেষ দণ্ডনীয় আচরণ*

(ক) পানোন্মত্ত অবস্থায় দণ্ডনীয় আচরণঃ

পরিমিত মাত্রায় সুরাপান সমাজ ও সংস্কৃতিতে নিষিদ্ধ না হলেও পানোন্মত্ততা একটি নিন্দনীয় আচরণ। মানুষের রক্তে সুরাসারের পরিমাণ অর্ধ শতাংশের অধিক (৫২%) হয়ে গেলে তার স্নায়ুতন্ত্রের উপর এমন একটি বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয় যার ফলে তার প্রতিটি আচরণ অসংযত হয়ে ওঠে। এই বিষদুষ্ট স্নায়বিক পরিস্থিতিতে মানুষ সাধারণতঃ অপ্রকৃতিস্থ বা বেহুঁস অবস্থায় থাকে। উগ্র সুরাসার পানে দেহের অভ্যন্তরে পরিপাক যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে (mucous membrane) অতিরিক্ত ক্ষরণে ক্ষতের সৃষ্টি হওয়ার ফলে দৈহিক যন্ত্রণা অনুভূত হয় এবং এই কারণেই যারা পরিমিত মাত্রায় সুরাপায়ী তারা উগ্র সুরাসার কখনো পান করে না। অন্য পানীয়ের সঙ্গে মিশ্রণের পর অনুগ্র সুরাসার দেহযন্ত্রের মধ্যে এমন এক মৃদু উত্তেজনার সৃষ্টি করে যার প্রতিক্রিয়ায় একটি উপভোগ্য মানসিক অবস্থা উদ্ভূত হয়; এই উপভোগ্য মানসিক অবস্থার (খুস্-মেজাজের) আকর্ষণেই অধিকাংশ ব্যক্তি নিয়মিত সুরাপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। জননেন্দ্রিয়ের উপর সুরাসারের উত্তেজক প্রভাব থাকায় সুরাপানে যৌন-উত্তেজনার মাত্রাধিক্য ঘটে।

সুরাসারের মাত্রাধিক্য গুরুমস্তিষ্কের (cerebral cortex) বিভিন্ন স্নায়ুকেন্দ্রকে নিস্তেজ করে দেওয়ায় মানুষের মনে সংযমের ক্ষমতা ও শালীনতা-বোধ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে; তার দায়িত্ব এবং কর্তব্য বোধ সাময়িকভাবে স্তিমিত হয়। তার মানসিক প্রতিক্রিয়ায় লজ্জা, দুশ্চিন্তা,

---

* রচনার অংশবিশেষ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কারা-প্রশাসন বিভাগের আমন্ত্রণে কারা বিভাগের কারেক্‌সন্থাল অফিসারদের ওরিয়েন্টেসন কোর্সে প্রদত্ত ১৯৭৩ এবং ৭৪ সালের ভাষণের ভিত্তিতে রচিত। এইজন্য আমি কারাবিভাগের ইনসপেক্টর জেনারেল শ্রী ডি. সি. মুখার্জী, আই এ. এস. এবং চীফ্ সিকিউরিটি অফিসার শ্রী পি. জি. মুখার্জী, আই. পি. এস. মহাশয়দের কাছে বিশেষ ঋণী।

এবং ভয় স্বাভাবিক ভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠতে পারে না। এই আচ্ছন্ন অবস্থায় সে এমন কতকগুলি আচরণ করতে পারে যেগুলি পানোন্মত্ততার প্রভাব নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর তার পক্ষে প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। অতিরিক্ত পানাসক্তি এবং তজ্জনিত দীর্ঘস্থায়ী উন্মাদনার নিরবচ্ছিন্ন প্রভাবে মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বটি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয় এবং ক্রমশ সে সুরাসার ব্যতিরেকে একটি জড় অবস্থায় উপনীত হয়। পানোন্মত্ত অবস্থায় অপ্রকৃতিস্থ বা বেহুঁস হয়ে থাকার সময়ে (drunk and incapable) মানুষ কখন, কিভাবে দণ্ডনীয় আচরণ করছে সে বিষয়ে তার কোনো খেয়াল থাকে না এবং মান-অপমান বোধ, লজ্জা, দুশ্চিন্তা, ভয়, ইত্যাদি মানসিক প্রতিক্রিয়ার অভাবে স্বীয় আচরণের বিপজ্জনক, ভয়াবহ বা কষ্টকর পরিণতি সম্পর্কেও সে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে। গুরুমস্তিষ্ক নিস্তেজ থাকার ফলে শিক্ষাদীক্ষা-অভিজ্ঞতার প্রভাবে গড়ে-ওঠা সংযমের শক্তি নিষ্ক্রিয় হওয়ায় ঐ সময়ে মানুষের ভিতরকার আদিম প্রকৃতি তার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ পায়—যে প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য হলো জৈব কামনার নগ্ন প্রকাশ, স্থান-কাল-পাত্র উপেক্ষা করে কাণ্ডজ্ঞানহীন অবস্থায় দৈহিক ক্ষুধার পরিতৃপ্তি। অত্যধিক পরিমাণে সুরাপানের পর মানুষ অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অজ্ঞান, অচৈতন্য হয়ে যাওয়ায় সহজেই স্বভাব-অপরাধীদের শিকার হয়ে পড়ে।

চরম অন্তর্দ্বন্দ্বের নিপীড়ন থেকে, রূঢ় বাস্তবের আঘাত থেকে সাময়িক নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য কোনো কোনো ব্যক্তি অত্যধিক সুরাপানে নিজেকে স্বেচ্ছায় অচৈতন্য অবস্থায় নিয়ে যায়। এই শ্রেণীর পানোন্মত্ত-দের অনেকে আবার কতকগুলি ঘৃণ্য, পশুবৎ, দণ্ডনীয় আচরণ করবার ঝোঁকে (অজ্ঞাত উন্মাদনার প্রভাবে) অত্যধিক সুরাপান করে থাকে। কারণ, স্বাভাবিক বা প্রকৃতিস্থ অবস্থায় ঐ সব ঘৃণ্য, পশুবৎ, দণ্ডনীয় আচরণ কোনোমতেই তারা করতে পারে না—বিবেক বাধা দেয়। যারা রীতিমত সুরাপানে অভ্যস্ত তাদের মধ্যেও এই ধরনের পানোন্মত্ততা মাঝে মাঝে দেখা যায়; কোনো কোনো ক্ষেত্রে সময়ের ব্যবধানে এর

পুনরাবৃত্তিও ঘটে। রীতিমত সুরাপানে অভ্যস্ত ব্যক্তিদের ক্রমশ দৈহিক ও মানসিক অবনতি দেখা যায়, এবং অবশেষে সুরাপানের প্রলোভনে তারা যে কোনো নীচ কাজ করতে পশ্চাৎপদ হয় না—এই অবস্থায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে স্বভাব-অপরাধী সমাজের সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে। অতিরিক্ত মাত্রায় দীর্ঘদিন সুরাপানের প্রভাবে মস্তিষ্ক বিকৃতি বা মনোবৈকল্য ঘটতেই পারে। এই ধরনের বিকৃতি বা বৈকল্যের লক্ষণগুলির মধ্যে উত্তেজনা, অনিদ্রা এবং কাল্পনিক ভীতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই অসুস্থতার শেষ পরিণতিতে সাময়িক স্মৃতিভ্রংশ দেখা দিতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোরসাকাউজ্ সাইকোসিস্ (Korsakow's Psychosis) মনোরোগটির উল্লেখ করা যেতে পারে।

অতিরিক্ত মাত্রায় দীর্ঘদিন সুরাপানের বিষক্রিয়ায় অধোগতির চরম পর্যায়ে যে সমস্ত ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক অসুস্থতা দেখা দেয় তারা সুস্থ স্বাভাবিক সংসার-জীবনে নানাবিধ সমস্যা সৃষ্টি করে। এই সমস্যাগুলির মূলে থাকে তাদের চিন্তা ও কল্পনার বিকৃতি, এবং ঐ বিকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে তারা নিজেদের অদ্ভুত খেয়াল-খুশি চরিতার্থ করতে গিয়েই দণ্ডনীয় আচরণের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। প্রসঙ্গক্রমে অধ্যাপক স্কটের একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করছিঃ "He imagines that he never gets a squre deal, that his wife is unfaithful to him and that his family plot against him. The person becomes heedless of his appearence, his work and his responsibilities. He is dismissed from his work, and imagines that this is the result of spite on the part of the management or his fellow workmen. A fairly common happening in such cases is a series of assaults on his wife or more rarely on his children. Or there may be indecent behaviour and sexual offences, usually

against young children···It is difficult to say just how many cases of insanity are caused by alcohol alone. Alcoholism is often associated with mental disorder and may be the precipitating cause of an attack, but the real origin is elsewhere."

দণ্ডনীয় আচরণ যাদের স্বভাব তাদের মধ্যে পানাসক্তের সংখ্যা খুব বেশি। সুরাপানের অথবা অন্য কোনো মাদকদ্রব্য সেবনের নেশা প্রায় প্রত্যেকটি প্রবীণ অপরাধীর থাকলেও সুরা অথবা যে-কোনো মাদক-দ্রব্যকে অপরাধমূলক আচরণের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী করা যুক্তিযুক্ত নয়। প্রকৃতিস্থ অবস্থায় সমাজের অনুশাসনকে উপেক্ষা করা যার পক্ষে সম্ভব নয়, তার মনের মধ্যে যখন ঐ অনুশাসনকে উপেক্ষা করবার একটা প্রচণ্ড তাগিদ স্বষ্টি হয় তখনই সে যে-কোনো একটা নেশা করে অপ্রকৃতিস্থ হতে চায় (এবং হয়)—অপ্রকৃতিস্থ অবস্থাতেই সে ঐ অনুশাসনকে উপেক্ষা করে এবং ঐ সময়ে ধরা পড়লে সে দণ্ডনীয় আচরণ করার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়, দণ্ডভোগ করে। সামাজিক পরিবেশে সহজ-ভাবে জীবন ধারণের পথে দারিদ্র্য, সাংসারিক বিপর্যয়, অত্যধিক অভাব, অনটন এবং উচ্ছৃঙ্খলতা যেমন মানুষের মনকে অপরাধমূলক আচরণের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে, অনুরূপভাবে মাদকদ্রব্যের বিষক্রিয়ায় মানুষের মনে অপরাধমূলক আচরণ প্রশ্রয় পায়। এই প্রসঙ্গে ডঃ নরউড্ ঈস্ট মন্তব্য করেছেন ঃ "Inebriety is not a disease. It can be induced by cultivation, and the desire for drink can be increased by indulgence...Prolonged sentences might be valuable because of the enforced abstinence but it is undesirable on other grounds that such cases be treated in prison. Inebriates require to be saved from themselves and from their associates, and they might in certain cases, derive benefit from the modern methods of psycho-

therapy, which conld be applied in special hospitals for inebriates."

আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, যে সমস্ত ক্ষেত্রে অপরাধ করবার উদ্দেশ্যে মানুষ স্বেচ্ছায় নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে সেখানে তার দণ্ডনীয় আচরণের প্রতি আগ্রহ যথেষ্ট বললে অত্যুক্তি হবে না। এই সব নেশাগ্রস্ত থাকার অজুহাতে অপরাধ স্খালনের চেষ্টা যুক্তিযুক্ত নয়। দণ্ডের অন্যতম উদ্দেশ্য অপরাধ প্রশমন সুতরাং নেশাগ্রস্ত থাকার অজুহাতে অপরাধী নিষ্কৃতি পেলে উক্ত উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না। সুরাপানের প্রতি অত্যধিক আসক্তি বা পানোন্মত্ততাকে সব ক্ষেত্রে অপরাধীর আত্মপক্ষ সমর্থনের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করলে স্বভাব-অপরাধীদের দ্বারা কৃত অপরাধের মাত্রা হ্রাস করা দুরূহ হবে। সুতরাং শুধু যুক্তি-তর্ক এবং সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে এই শ্রেণীর অপরাধীদের দণ্ড সম্পর্কে সিদ্ধান্ত না করে অভিজ্ঞ মনোবিদ্‌দের অভিমতগুলিও বিবেচনা করা উচিত।

(খ) যৌন-অপরাধ বা দণ্ডনীয় যৌন আচরণ

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে যৌন-আচরণের স্বাভাবিক চরিত্র নির্ধারিত হয়ে থাকে। বিশেষ বিশেষ সমাজ ব্যবস্থায় যে সমস্ত যৌনাচার ও আচরণ নিষিদ্ধ সেইগুলি কদাচার বিবেচনায় দণ্ডনীয় আচরণের পর্যায়ভুক্ত হয়। সুতরাং অননুমোদিত যৌন আচরণ বা নিষিদ্ধ পথে যৌনাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করা এবং ঐ কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ-ভাবে জড়িত অন্যান্য কাজগুলিও যৌন অপরাধ হিসাবে বিবৃত হয়ে থাকে। যৌন অপরাধগুলিকে সচরাচর নিম্নলিখিত শ্রেণীতে পৃথক করা যেতে পারে:

(১) যে সমস্ত ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষে যৌন-সংসর্গ নিষিদ্ধ, সেই সব ক্ষেত্রে নিষেধ অমান্য করে যৌন-সংসর্গের দ্বারা যৌন আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি লাভ করা একটি বিশেষ শ্রেণীর যৌন অপরাধ। এই ক্ষেত্রে পরিতৃপ্ত হওয়ার উপায় অপরাধের

চরিত্র নির্দ্দিষ্ট করে থাকে ; যেমন, বলাৎকার, শ্লীলতাহানির অথবা যৌন-পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে অপহরণ, শ্লীলতাহানি। ধর্ষণ এবং অবৈধ যৌন-সংসর্গের উদ্দেশ্যে দেহ বিক্রয়। এই শ্রেণীর অপরাধের মধ্যে আরো কতকগুলি যৌন-কদাচার অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে যেমন, অগম্যাগমন বা ব্যভিচার, অবিবাহিতদের মধ্যে যৌন-সম্ভোগ এবং অজাচার (incest)।

(২) বিষম কামাচার এক শ্রেণীর যৌন অপরাধ। এই অপরাধে অভিযুক্ত অপরাধীদের মধ্যে লালসার তীব্রতা এবং তজ্জনিত বিকৃতিগুলি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যেমন, গৃহপালিত পশুর অথবা প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী বা পুরুষের পায়ু-মেহন (pederasty)। এই ধরনের অপরাধের উদ্যোগপর্বে কোনো ব্যক্তি ধৃত হলে তার আচরণও দণ্ডনীয় বিবেচিত হয়। লোকালয়ের যে সব স্থানে জনসাধারণের অবাধ গতিবিধি সেখানে কোনো ব্যক্তিবিশেষের (স্ত্রী, পুরুষ নির্বিশেষে) যৌন-পরিতৃপ্তির প্রয়াসকেও এই শ্রেণীর দণ্ডনীয় আচরণের পর্যায়ভুক্ত করা হয়ে থাকে। প্রকৃত যৌন-কদাচার ব্যতিরেকে যে সব যৌন-কদাচার দণ্ডনীয় তাদের মধ্যে প্রকাশ্যে সমলিঙ্গে যৌনাচার, হস্ত-মৈথুন, যৌন অঙ্গ প্রদর্শনের মাধ্যমে অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ, অপরের অথবা নিজের শারীরিক নির্যাতনের বা নিপীড়নের মাধ্যমে যৌনসম্ভোগের তৃপ্তি লাভ, বস্তুকাম বা বস্তুরতি (fetishism), যৌন পরিতৃপ্তির সুযোগ গ্রহণের জন্য বিপরীত লিঙ্গের ছদ্মবেশ ধারণ, এবং অপরের (স্ত্রী-পুরুষের) স্বাভাবিক রতিক্রিয়ার প্রতিটি আচরণ 'গোপনে দেখার' মাধ্যমে যৌন পরিতৃপ্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিষম কামাচারে লিপ্ত অপরাধীদের মধ্যে যারা নিজেদের যৌন-ক্ষমতা সম্বন্ধে কোনো নির্জ্জাত কারণে নিঃসন্দেহ হতে পারে না, তাদের সাধারণতঃ অপ্রাপ্তবয়স্কদের অপরিণত বুদ্ধি বা বিকলাঙ্গদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে যৌন-কদাচারে লিপ্ত হতে দেখা যায়।

(৩) কামান্ধ ব্যক্তি বা বিকৃত-কামী ব্যক্তি নিজের লালসা পরিতৃপ্তির জন্য ঈপ্সিত ব্যক্তিবিশেষ বা বস্তুবিশেষকে করায়ত্ত করতে গিয়ে নিজে (অথবা তার দ্বারা প্ররোচিত কিছু ব্যক্তি) একই সূত্রে গাঁথা কয়েকটি গুরুতর, এমন-কি মারাত্মক অপরাধ করে থাকে। এই শ্রেণীর অপরাধীরা নিজেদের অভীষ্ট সাধনের জন্য নরহত্যা, অপহরণ, আটক করে রাখা, ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায়, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ বা বীভৎস কাজে নিজেদের লিপ্ত করে থাকে। মূলতঃ যৌন-পরিতৃপ্তি এদের দণ্ডনীয় আচরণে প্রবৃত্ত করায় এরা যৌন-অপরাধীর পর্যায়ভুক্ত হয়ে থাকে।

যৌন-অপরাধ এবং অপরাধী সম্পর্কে কয়েকজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশেষজ্ঞের বিবৃতি পাঠকদের জ্ঞাতার্থে উদ্ধৃত করছি ঃ

(১) "Various state statutes characterize the sexual psychopath, the criminal sexual psychopath, or the psychopathic personality as a person, not insane or feeble-minded, but who has given evidence over a period of time, in acts constituting a continuous behaviour pattern, of sexual deviation and of behaving in such state of mental aberration that he cannot control his impulses towards the commission of sex offenses." [Dr. Benjamin Karpman, Chief Psychotherapist, Saint Elizabeth's Hospital, Washington, D. C. in The Sexual Offender & His Offences, Julian Press, N. Y., 1954.]

(২) "Diagnosis of the sexual psychopath is besed on the following :

(1) He must be guilty of aggressive sexual acts against minors or against society.

It must be : (2) continual behaviour pattern ; (3) not mutual sexual relationship between adults ; (4) not an isolated sexual act ; (5) not alcoholism ; (6) not insanity or feeblemindedness." [Haines, W. H., Hoffman, H. R., and Esser, R. H., Commitments under the Criminal Sexual Psychopath Law in the Criminal Conrt of Cook County, Illinois. American Journal of Psychiatry, Vol. 105, Dec. 1948, pp. 420-25.]

(৩) Sexual psychopath may be characterized as having :

"(1) Lack of conscience or superego, hence absence of ordinary guilt feelings, (2) deficient attachment or affection ; disposition to ruthlessness and exploitation, (3) excessive aggression directed outward against environment, (4) infantile level response, seeking immediate satisfaction, often in primitive forms of behaviour, sexual and otherwise." [Tappan, Paul, Sex Offender Laws and Their Administration, Federal Probation, September 1950, Vol. 14, No 3. pp. 32-37.]

(৪) According to Minnesota Supreme Court interpretation :

"Those persons by habitual course of misconduct in sexual matters have evidenced an utter lack of power to control their sexual impulses and who as a result are likely to attack or otherwise inflict injury,

loss, pain or other evil on objects of their uncontrolled and uncontrollable desire." [Hughes, James E., The Minnesota 'Sexually Irresponsibles' Law. Mental Hygiene, Vol. 25, No. 1., January 1941, pp. 76-86.]

(৫) "The offender must have been guilty of repetitive compulsive acts having a (dynamic) pattern of similarity and carried out to the point of community intolerance. Such acts manifest a heedless disregard of consequences and seek, and attain ultimate expression even if momentary obstacles are encountered." [Committee on Forensic Psychiatry of the Group for the Advancement of Psychiatry. Report 9 (Revised), February 1950, Topeka, Kansas.]

যৌন-অপরাধীদের অপরাধমূলক আচরণ থেকে নিবৃত্ত করবার জন্য অস্ত্রোপচারের সাহায্যে অথবা যৌন-গ্রন্থিরস প্রসূত ঔষধের প্রয়োগে চিকিৎসায় কোনো ক্ষেত্রে সাময়িক সুফল পাওয়া গেলেও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে উক্ত চিকিৎসা পদ্ধতি কোনো মতেই নির্ভরযোগ্য বলা চলে না। কয়েকটি ক্ষেত্রে এই ধরনের অপরাধীদের মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্রগুলি তড়িতাহত (Electric Shock Therapy) করবার পরও বিশেষ কোনো অনুকূল প্রভাব সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। আপাতদৃষ্টিতে কারাগারের আবাসিক জীবনের দৈহিক নির্যাতন এই শ্রেণীর অপরাধীর আচরণ-সংস্কারের প্রকৃষ্ট উপায় মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি—বিশেষতঃ বিষম-কামী অপরাধীদের ক্ষেত্রে কারাগারের বাইরে অথবা ভেতরে থাকার জন্য কামাতুরতার কোনো তারতম্য ঘটে না; উন্মাদনার প্রচণ্ড চাপ তাকে কাণ্ডজ্ঞানরহিত করে তোলে; ফলে স্থান-

কাল-পাত্র ভেদে সে সুযোগমত (সুযোগ পেলে অথবা সুযোগ সৃষ্টি করে নিয়ে) তার উন্মাদনা প্রশমন করে। শুধুমাত্র কারাগারে আটক না রেখে, বন্দী অবস্থায় এদের মানসিক চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করতে পারলে তবেই এদের আচরণে সংযম আনা সম্ভব। দীর্ঘ মেয়াদী কয়েদীদের মধ্যেও অনেক সময় যৌন-অপরাধের ঘটনা ঘটে থাকে কারণ, এদের জৈব উত্তেজনার হ্রাস-বৃদ্ধির উপর কারাগারের জীবন বিশেষ কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। বিষম-কামী অপরাধীদের দ্বারা যাতে সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয়, সে সম্পর্কে তিনটি সুচিন্তিত মতামত উল্লেখ করছি।

(১) "The rational approach is to remove the potential offender from society for as long as period as he is dangerous to society and to himself." [Burlinghame, C. C., The Violent Sex Offender—Criminal or Sick? The Institute of Living. Digest of Neurology of Psychiatry, Series No. 18, May 1950, pp. 267-68.]

(২) "Sexual deviates should be committed to institutions for supervision and study. Such institution should be mainly protective." [Gardner, G. E., The Community of the Aggressive Child. Mental Hygiene, Vol. 34, January 1950, pp. 44-63.]

(৩) "When sadistic impulses dominate, the offender should be placed in an institution for psychologic and psychriatic study." [Mayer, E. E., The Sex Deviate, The Pennsylvania Medical Journal. Vol. 63, January 1950, pp. 32-37.]

সমাজ ও জনসাধারণের আগ্রহ না থাকলে যৌন অপরাধের সংখ্যা হ্রাস করা সম্ভব নয়। সকলের সহযোগিতা না থাকলে বিষম-কামী

ব্যক্তিদের সন্ধান পাওয়া যেমন দুরূহ তেমনি অনেক ক্ষেত্রে তাদের দুষ্কৃতির প্রমাণ সংগ্রহ করাও দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। যারা এই শ্রেণীর অপরাধীদের কবলে শিকার হয় তাদের অভিভাবকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেদের পারিবারিক মানমর্যাদার স্বার্থে ঘটনার বিবরণ প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক হন, ফলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষম-কামী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন না। অবশ্য আমাদের দেশে এই ধরনের অপরাধীদের জন্য বিশেষ সংশোধনাগারের কোনো ব্যবস্থা এখনো প্রচলিত হয়নি—বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে যে কারা বিভাগের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে প্রচেষ্টা চলছে। বিষম-কামী ব্যক্তিদের বয়ঃসন্ধির সময় থেকেই এমন কতকগুলি রুচি-বিকৃতির পরিচয় পাওয়া যায় যেগুলির সাহায্যে মনোবিদ্‌রা এদের উত্তর জীবনে বিষম-কামী হওয়ার সম্ভাবনাকে ধরতে পারেন। সুতরাং পরিবারের প্রত্যেকের, বিশেষতঃ অভিভাবকদের মনে তাদের ছেলেমেয়েদের রুচি-বিকার সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ এলে অনতিবিলম্বে মনোবিদ্‌দের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক ডানহাম্‌-এর উক্তি উল্লেখযোগ্য ঃ

"Preventive treatment must concentrate on persons who in their teens show tendencies toward sexual deviation and toward known deviates, to prevent reoccurrence. We must attempt to get at the potential deviate and the first offender for treatment purposes ; must develop better screening techniques for distinguishing the treatable from untreatable ; provide more facilities in the community for treatment of cases at the initial manifestations." [Dunham H. W., Crucial Issues in the Treatment and Control of Sexual Deviation in the Community : Report & Recommendation, Dept. of Mental Health, Michigan, 1951.]

বিষম-কামী নয় এমন ব্যক্তিদেরও যৌন অপরাধে লিপ্ত হতে দেখা

যায়। ঘটনাচক্রে ব্যক্তিবিশেষের এই ধরনের অপরাধ করে ফেলার সম্ভাবনা সম্পর্কে একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশেষজ্ঞের অভিমত পাঠকদের জ্ঞাতার্থে বিবৃত করছি :

"No man can guarantee when another man will or will not commit a sex crime." [Ploscowe, Morris., The Sexual Psychopath. Some Suggestions for Control, Prison World, Vol. 9., No. 4., 1947. p. 18.]

(গ) বাতুল ব্যক্তির দণ্ডনীয় আচরণ পর্যালোচনা

বাতুলতার (insanity) প্রভাবে অপরাধমূলক আচরণ করলে বাতুলকে অপরাধী হিসাবে গণ্য করে একই ধরনের দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া যাবে কিনা সে সম্পর্কে বিতর্কের এখনো অবসান হয় নি। ১৮৪৩ সালে Macnaghten মামলা সম্পর্কীয় যুক্তি-তর্কগুলি এই বিতর্কের সূতপাত করে। এই বিষয়টিতে প্রতিপাদ্য হলো যে কোনো ব্যক্তি অপরাধমূলক আচরণে লিপ্ত হওয়ার সময় বাতুলতার প্রভাব মুক্ত ছিল, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে হবে, অর্থাৎ সে যে কাজটি করছে সেই কাজের পরিণাম উপলব্ধি করবার ক্ষমতা তার ছিল কি না, সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে। এই নিঃসন্দেহ বা নিশ্চিত হবার সমস্ত দায়িত্ব বিচারকমণ্ডলীর—যাঁদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকলে কোনো অপরাধী বাতুলতার অজুহাতে সহানুভূতি পাবে না। যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে বাতুল, মনোবিদ্‌দের মতে তার চিন্তাধারার অসংলগ্নতার জন্য তার অপরাধ-অক্ষমতাই স্বভাবসিদ্ধ। সুতরাং তার পক্ষে অপরাধের উদ্দেশ্যে কোনো সুপরিকল্পিত পন্থা গ্রহণ করা সম্ভব নয়, এবং ঘটনাচক্রে তার দ্বারা অপরাধের সমতুল কোনো কাজ অনুষ্ঠিত হলেও তার আচরণে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার কোনো অভিসন্ধিও পরিলক্ষিত হবে না। সুতরাং তাকে কেন্দ্র করে আইনের আঙ্গিনায় যে যুক্তিতর্কের অবতারণা হয় সেগুলির প্রতি তার নিরাসক্ত মনোভাবই প্রকাশ পায়—অর্থাৎ শাস্তি-ই ভোগ করুক অথবা নিষ্কৃতি-ই লাভ করুক তার বাতুলতাগ্রস্ত মনে ঐ দুটির কোনোটিই রেখাপাত করবে না। কোনো উদগ্র কামনা বা কোনো লোভনীয় বস্তুকে করায়ত্ত

করবার অদম্য স্পৃহা অনেক সময় মানুষকে অপরাধের পথে নিয়ে যায়—এই ক্ষেত্রে তার ঈপ্সিত বস্তু লাভ করবার জন্য সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে এগিয়ে যাওয়ার মতো মানসিকতা অক্ষুণ্ণ থাকে এবং তার আচার-আচরণে নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতা সম্পূর্ণ বর্তমান থাকে। নিজেকে বাঁচাবার জন্যে সে বাতুলতার ভান করলেও তার অতীতের জীবন-ইতিহাস এবং অন্যান্য আচার-আচরণ পরীক্ষা করলে সে যে বাতুল নয়, তা প্রমাণ করা কষ্টসাধ্য হলেও সম্ভব।

আইনের আঙ্গিনায় সাময়িক বাতুলতা (temporary insanity) অনেক সময় ব্যক্তিবিশেষের দণ্ডনীয় আচরণের অভিযোগ খারিজ করার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়ে থাকে। সাময়িক বাতুলতার প্রভাবে মানুষ যেমন আত্মহত্যা করতে পারে তেমনি নরহত্যাও করতে পারে। চিত্তভ্রংশী-বাতুলতা (Schizophrenia), ভ্রম-বাতুলতা (Paranoia), বিভ্রম-বাতুলতা (Para-phrenia), এবং আবেশজ বাতুলতার (Obssess-ional Psychoneurosis) দ্বারা আক্রান্ত মনোরোগীর উন্মাদনার কোনো সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তে রোগী নিজের অজ্ঞাতে দণ্ডনীয় আচরণ করে ফেলতে পারে—তবে এই পরিস্থিতিকে আপাতদৃষ্টিতে সাময়িক বাতুলতা মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা নয়। কয়েকটি বিশেষ চরিত্রের মৃগীরোগী রোগাক্রান্ত অবস্থায় অপরাধমূলক আচরণ করে থাকে—এই সব অসুস্থদের আচরণকেও সাময়িক বাতুলতার সমপর্যায়ভুক্ত করা উচিত নয়।

আইনের আঙ্গিনায় অপরাধের সময়ে ব্যক্তির মানসিকতা যেমন গুরুত্ব পেয়েছে তেমনি অপর কয়েকটি ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে স্বীকৃতি পেয়ে থাকে। যেমন: (১) বিচার বা তদন্ত চলার সময়ে, (২) সওয়ালের শেষ এবং রায়দানের অন্তর্বর্তীকালে, (৩) উচ্চতর আদালতে সুবিচারের প্রার্থনা জানাবার পরবর্তী সময়ে, এবং (৪) কারাগারে দণ্ডভোগ করবার সময়ে। এই সময়ে মানসিকতা বিপর্যস্ত হলে বা অটুট না থাকলে আইনের দৃষ্টিতে ব্যক্তিবিশেষের আচরণ মানসিক অসুস্থতার সমতুল হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

আইনের সাহায্যে ব্যক্তিবিশেষের মানসিকতার বিচার করা বোধহয় সম্ভব নয়। আইন, মিস্টার হাইডের বিচার করে ফাঁসীর আদেশ দিতে পারে কিন্তু ডক্টর জেকিলকে পরীক্ষা করে বোঝবার মতো ক্ষমতা আইনের নেই। কোনো ব্যক্তিকে অপরাধী প্রমাণ করবার জন্য যে পরিমাণ যুক্তি-তর্কের অবতারণা করা হয় তার এক-চতুর্থাংশ যুক্তি-তর্কের সুযোগ দণ্ডের চরিত্র (প্রকার) নির্ধারিণের জন্য পাওয়া যায় না। অভিযোগ প্রমাণিত হবার পর দণ্ডাজ্ঞার সঙ্গে কতদিন দণ্ডভোগ করবে তা স্থির করে দেওয়া হল। কিন্তু দণ্ডভোগ করার সময়ে, মানসিকতার দিকটা চিন্তা করে, কি ধরনের কাজের মাধ্যমে অপরাধীর চিন্তাধারায় স্বাভাবিকতা ফিরে আসবে তার কোনো সঠিক নির্দেশ আইনের কাছ থেকে পাওয়া যায় না, এবং যায় না বলেই দীর্ঘমেয়াদী কয়েদীদের মানসিকতার অবনতি স্বাভাবিক ভাবে ঘটে থাকে। সুতরাং মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তি অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত হলে তার অসুস্থতার কথা বিবেচনা করে বিচার চলার সময় থেকেই তাকে উপযুক্ত চিকিৎসা-কেন্দ্রে মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের চিকিৎসাধীন রেখে দিতে হবে। বিচারে দোষী প্রমাণিত হবার পর দণ্ড যত দীর্ঘমেয়াদী হোক না কেন, তাকে কারাগারে সাধারণ শ্রেণীর আবাসিক-কয়েদী হিসাবে রাখা যুক্তিসঙ্গত হবে না। দণ্ডভোগের সময়ে তাকে কারা বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন উপযুক্ত চিকিৎসা-কেন্দ্রে মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের চিকিৎসাধীন রাখতে হবে। পাগলকে খুনের দায়ে জড়িয়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দেওয়ার মধ্যে মানবিকতার ছোঁয়াচ কোথায়? মানবিক স্বার্থে বাতুল অপরাধীদের মনোবিজ্ঞান-সম্মত চিকিৎসার একান্ত প্রয়োজন। এই সব বিধান দেওয়ার পথে আইনের বাধাগুলি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে অপসারণ করতে হবে।

বিভিন্ন ধরনের মানসিকতার পরিপ্রেক্ষিতে এবং মানসিক সুস্থতা-অসুস্থতার তারতম্য বিবেচনায় দণ্ডাধীন ব্যক্তিরা কোন্ কোন্ ধরনের কাজকর্মের সঙ্গে কারাগার-জীবনে যুক্ত থাকবে, এবং কি ধরনের কার্য-প্রণালীর মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে পারলে দণ্ডভোগের পর সমাজ-জীবনে

তাদের প্রত্যাবর্তন সম্ভব হবে—কারাগার কর্তৃপক্ষ এই সম্পর্কে মনোবিদ্‌দের পরামর্শ ও সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারেন। প্রয়োজন বোধে সরকারের অনুমোদন নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞমণ্ডলীর উপর এই দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। আইনের বুনিয়াদী নীতিগুলিতে পরিবর্তন আনা কঠিন কাজ, কিন্তু আইনের ধারায় পরিবর্তন বা নতুন সংযোজন সম্ভব। এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে যাওয়ার আগে একটি সুচিন্তিত প্রকল্পের মাধ্যমে স্থির করতে হবে—মানসিক অসুস্থ ব্যক্তি দণ্ডভোগ করবে কিভাবে, তাকে সুস্থ করে তোলার সুযোগ সুবিধা দেওয়ার দায়িত্ব সরকারের কোন্ বিভাগের, এবং এই ধরনের পরিকল্পনা প্রণয়নের ও প্রয়োগের দায়িত্ব কি ধরনের বিশেষজ্ঞমণ্ডলীর উপর ন্যস্ত থাকবে। এই প্রকল্পের সাফল্যের ভিত্তিতেই আমাদের আইনের পরিবর্তন সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে—নচেৎ আইন হয়তো পরিবর্তিত হবে, কিন্তু মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত দণ্ডভোগকারীদের অবস্থা অপরিবর্তিত থেকেই যাবে।

মনোবিজ্ঞানে অপরাধ-প্রসঙ্গ*

আমাদের জীবন গতিশীল। সমাজ সংস্কৃতির সঙ্গে জীবনের গতিকে ছন্দোবদ্ধ করে রাখার জন্য আমাদের চিন্তাধারাও নিয়ত পরিবর্তনশীল। সুস্থ ও স্বাভাবিক সমাজ-জীবন যাপন করবার জন্য শিশুকাল থেকে আমরা সমাজ ও সংস্কৃতির একটা নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে শিক্ষা পেয়ে থাকি। এই শিক্ষার ফলে আমাদের সমাজ-জীবনের আচরণে সুসংযত ভাবটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। দূরদৃষ্টির আলোকে এই সুসংযত আচরণের একটি বিশেষ মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। শিক্ষাদীক্ষা ও রুচিজ্ঞান বর্জিত শিশুমনের পরিপূর্তির সময়ে তার মধ্যে পরিবেশের সঙ্গে প্রতিমুহূর্তেই যে মিথস্ক্রিয়া (interaction) বা আভ্যন্তর-ঘাতপ্রতিঘাত চলতে থাকে তার প্রভাবেই মানস প্রক্রিয়া সুবিন্যস্ত হয়, চিন্তাধারায় সংযম আসে, এবং জ্ঞানের পরিধি যতই প্রসারিত হয় ততই মনের পরিপূর্তি ঘটে। সাধারণতঃ পরিপূর্ত মনে সমাজ ও সংস্কৃতির বিধিনিষেধগুলি সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়ে সংযমের এমনি একটি বাঁধ গড়ে তোলে যা ব্যক্তিবিশেষকে গর্হিত, সমাজ-বিরোধী, ও সংস্কৃতির পরিপন্থী কাজগুলির প্রতি বীতস্পৃহ করে রাখে। এই বীতস্পৃহার ফলেই আমরা সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমাদের জীবনের গতিপথ সৃষ্টি করে থাকি। মন যতই পরিপূর্ত হয় ততই আচরণের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষা ও রুচিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়; পরিপূর্তি একটি পরিণতি। মনের ক্ষেত্রে এই পরিণতির প্রভাব মনের আমূল পরিবর্তন করতে পারে না। তাই পরিপূর্ত মনেরও অন্তরালে কিছুটা অপরিবর্তিত থেকে যায়। যেমন, পৃথিবীর উপরটা শীতল হলেও তার ভেতরটা এখনো উত্তপ্ত, অগ্নিকুণ্ড বিশেষ—যার প্রমাণ আমরা পেয়ে থাকি ভূমিকম্পে, আগ্নেয়গিরির

---

* ১৯৭৪ সালের আগষ্ট মাসে বিশাখপত্তনমে (অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে) অনুষ্ঠিত 5th International Conference of Humanistic Psychologyতে লেখকের আমন্ত্রিত রচনা "Crime & Treatment of Criminals—a Humanistic Approach" হইতে সংগৃহীত উপাদানের ভিত্তিতে লিখিত।

বিস্ফোরণে। সুতরাং আমাদের মনের ওপর সমাজ ও সংস্কৃতির প্রলেপ পড়ে মনকে মার্জিত রুচিসম্পন্ন করলেও মনের ভেতরে শিক্ষাদীক্ষা ও রুচিজ্ঞান বর্জিত আদিম ভাব ও প্রবৃত্তিগুলি থেকে যায়। সংযমের বাঁধ তাদের সব সময়ে প্রকাশ পেতে না দিলেও মাঝে মাঝে তারা প্রকট হয়ে আচরণকে আদিমতার বন্যায় ভাসিয়ে দেয়। মনের এই বন্যাকে আমরা পূর্বোক্ত পৃথিবীর বিস্ফোরণের (ভূমিকম্প বা অগ্ন্যুৎপাত) সঙ্গে তুলনা করতে পারি। সমাজ-জীবনের পটভূমিকায় জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত চাহিদাগুলি মেটাবার জন্য, ব্যক্তিগত অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য, এবং ঈপ্সিত বস্তুকে না পাওয়া অবধি মনে যে উত্তেজনা জন্মায় তা প্রশমন করবার জন্য আমরা সাধারণতঃ স্বেচ্ছাচার করি না—কারণ, সমাজ ও সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করে স্বেচ্ছাচারী হওয়া সমাজের কাছে অনভিপ্রেত। সুতরাং সমাজের কাছে যা অভিপ্রেত সেই দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে আমাদের চাহিদাকে প্রকাশ করতে হয়, প্রয়োজনমতো অভীষ্ট সাধনের পথ বদলাতে হয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঈপ্সিত বস্তুকে পাওয়ার আশা যুক্তির দোহাই দিয়ে ত্যাগ করতে হয় অথবা সমাজানুগ পদ্ধতিতে ঈপ্সিত বস্তুটির নাগাল পেতে হয়। আমাদের জীবনের প্রতিটি সক্রিয় মুহূর্তে আমরা সমাজের কাছে যা অভিপ্রেত তার সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে চলছি, এবং যা অনভিপ্রেত তা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে চলছি। কোন্‌টি সমাজের কাছে বাঞ্ছিত বা নিষিদ্ধ সে সম্বন্ধে আমরা জ্ঞান লাভ করি পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশার সময়ে—ঠেকে, দেখে এবং শুনে—মিথস্ক্রিয়ার ফলে আমাদের যে বিশেষ বোধ জন্মায় তার সাহায্যে। আমাদের এই বিশেষ বোধশক্তির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকে ঐতিহ্য, আচার, সংস্কার, ভাষা, নীতি, সহবৎ, আইনের নিষেধ, অনুশাসন ইত্যাদির প্রভাবগুলি। বোধশক্তির সঙ্গে উক্ত প্রভাবগুলি মিশে গিয়ে মানুষের মনে উচিত-অনুচিতের জ্ঞান এবং কর্তব্যবোধের সৃষ্টি করে। মনের মধ্যে সমাজের নির্দেশগুলির প্রভাব দৃঢ়ভাবে সংরক্ষিত থাকার ফলে মানুষের আচরণে একটি বিশেষত্ব পরিস্ফুট হয়—যার সাহায্যে সে সমাজ জীবনে মানিয়ে নিয়ে চলতে

পারে। প্রতিটি মানুষের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য থাকলেও একই সমাজ ও সংস্কৃতির প্রভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে একই সমাজে যারা বাস করে তাদের আচরণের মধ্যে একটা সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। আমাদের আচরণের এই সাদৃশ্যই আমাদের চিহ্নিত করেঃ আমরা কোন্ দেশের, কোন্ অঞ্চলের, কোন্ সমাজের অন্তর্ভুক্ত, কি ধরনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে লালিত-পালিত।

এখানে যে 'মানিয়ে নেওয়ার' কথা বলা হয়েছে সেটি সম্পূর্ণ মনোজগতের প্রক্রিয়া—সমাজের চাহিদা এবং ব্যক্তিগত চাহিদার মধ্যে একটা সমঝোতা বা আপোস। মন যা চাইছে সমাজের বিধিনিষেধ যদি তা পেতে না দেয় তখন মন তা পরোক্ষভাবে পেতে চেষ্টা করে, সমাজানুগ কোনো পরিবর্তিত পথে পাবার চেষ্টা করে অথবা সামাজিক অনুশাসনের ভয়ে পাবার ইচ্ছাকে দমন করে। মনের এই সব বিচিত্র মানিয়ে নেওয়ার পদ্ধতিগুলি মানুষের সংযত আচরণের গতি ও প্রকৃতিকে নির্ধারিত করে। সমাজ-জীবনে অধিকাংশের মধ্যে এই মানিয়ে নিয়ে চলার সময়ে অসুবিধে হলেও সাধারণতঃ ছন্দপতন ঘটে না। কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যভেদে ছন্দপতন ঘটে, ব্যতিক্রম ঘটে—ব্যক্তি বিশেষের মনোজগতে এমন কতক-গুলি পরিবেশ-সৃষ্ট প্রভাব আসে যার ফলে তার মন সমাজের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে চলতে রাজী হয় না। এদের মনে হয়—সমাজ এদের কাছে বড়ো বেশি দাবি করছে, যে দাবিগুলির সঙ্গে আপোস করা এরা নিরর্থক মনে করে। এরা সমাজ-জীবনের ছন্দকে অনুসরণ না করে নিজের সুযোগ, সুবিধা এবং দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী নিজের উপযোগী একটা ছন্দ গড়ে তুলে সেই মতো চলে বাঁচতে চায়। এরা নিজের মতো স্বেচ্ছাচারে, একটা পথ বেছে নিয়ে সেই পথে, জীবন কাটালেও সমাজ এদের ছন্দ-ছাড়া বা ব্যতিক্রম হিসাবে ধরে নেয়। সমাজ-জীবনে যারা ছন্দ-ছাড়া বা মূর্তিমান ব্যতিক্রম তাদের আচরণের বৈশিষ্ট্য হল সমাজের বিধিনিষেধ এবং চিরাচরিত প্রথাগুলির প্রতি অবজ্ঞা দেখানো। এদের আচার-ব্যবহারে, রীতিনীতিতে যে সব যুক্তি, ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গী পরিস্ফুট হয় সেগুলির মধ্যে দিয়ে সমাজের বিরুদ্ধে তাদের মনের প্রতিক্রিয়াগুলি

বিভিন্নভাবে প্রকাশ পায়। সমাজের ও সংস্কৃতির প্রতি তাদের আস্থা ও শ্রদ্ধা ফিরিয়ে আনতে গেলে, বিপথ থেকে এদের স্বাভাবিক সামাজিক জীবনের পথে নিয়ে যেতে হলে, কেন এদের মনে সমাজের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তার রহস্যটি অনুধাবন করতে হবে। স্বাভাবিক সমাজ-জীবনে এদের প্রত্যাবর্তনের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এদের জীবনের ওপর অতীতের পরিবেশ-সৃষ্ট সমস্ত অবাঞ্ছিত প্রভাবগুলিকে বুঝতে হবে, এদের মনের ক্ষোভ, চাহিদা এবং প্রদমিত উত্তেজনার বৈশিষ্ট্যগুলিকে সঠিক ও স্পষ্টভাবে জানতে ও বুঝতে হবে—না-জানলে, না-বুঝলে এদের জীবনে কোনো এক সময়ে যে-সব সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল সেগুলির প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া থেকে এদের চিন্তা ও আচরণকে মুক্ত করা সম্ভব হবে না। বিরূপ প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া থেকে তাদের মুক্ত করতে না পারলে তাদের আচরণে পরিবর্তন আনা যাবে না, ফলে সুস্থ সমাজ-জীবন যাপনের সুযোগ তারা বারবার প্রত্যাখ্যান করবে।

ছন্দ-ছাড়া জীবনের পথকে যারা বেছে নেয়, সমাজের কাছে তারা মূর্তিমান ব্যতিক্রম, তাদের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের আচরণ সময়ে সময়ে এমনভাবে প্রকাশ পায় যা আইনের বিচারে অপরাধরূপে বিবৃত হয়ে থাকে। এই সব ব্যক্তি সুপরিকল্পিতভাবে আপন খেয়ালে নিজ-উদ্ভাবিত উপায়ে স্বীয় অভীষ্ট সাধন করে বা এমন ধরনের কাজের মাধ্যমে নিজের বেঁচে থাকবার উপায় ও পথ বেছে নেয় যা সমাজ ও সংস্কৃতির, ঐতিহ্যের, ন্যায়নীতির, সংযমের ও আইন-কানুনের গণ্ডিতে অবাঞ্ছিত, এবং যা মানবপ্রেমী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে নিন্দনীয়। এই সব ব্যক্তির আচরণকে অপরাধমূলক আচরণ আখ্যা দেওয়া হয়।

মানুষের আচরণ কেন অপরাধমূলক হয় তার কারণ শুধু মানুষের মধ্যে অথবা তার সামাজিক পরিবেশের মধ্যে সঠিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ, মানুষের সঙ্গে পরিবেশের মিথস্ক্রিয়ার সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তগুলিতেই অপরাধমূলক আচরণের প্রভাবী কারণগুলি জড়িয়ে থাকে—সমাজ-জীবনের সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তগুলিতে সমাধানের উপায় খুঁজে না-পেয়েই

মানুষ সচরাচর পথভ্রষ্ট হয়, লক্ষ্য হারিয়ে ফেলে ; ঘটনাচক্রের বিপর্যয়ে এমন পথে সে বাঁচতে চায় যা গর্হিত, অবাঞ্ছনীয়, অপরাধ হিসাবে পরিগণিত হয়ে থাকে। কোনো একজন অপরাধ করেছে বা আইনের বিচারে অপরাধী হয়েছে বলতে আমরা তার কোনো আচরণের অস্বাভাবিকতাকেই বুঝি। যে-কোনো আচরণই অপরাধমূলক হয়ে উঠতে পারে যদি তা বিধিবহির্ভূত উপায়ে প্রকাশ করা হয়, অর্থাৎ যে আচরণ সমাজের স্বীকৃতি পায় না, আইনের কাঠামোয় অনুমোদিত হয় না, সেই আচরণকেই আমরা অপরাধের পর্যায়ে ফেলি। এইজন্য অপরাধ করার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত কোনো ব্যক্তির সহজাত গুণাবলী অক্ষুণ্ণই থাকে ; এমন কি অপরাধ অনুষ্ঠানের সময়ে অথবা তার পরেও সেগুলি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকতে পারে না। বরং অপরাধ করার সময়ে সে তার ব্যক্তিগত গুণাবলী ও অধিকারকে (যেমন, বুদ্ধি, দক্ষতা, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পারদর্শিতা, সামাজিক সুযোগ সুবিধা প্রভৃতিকে) সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে তৎপর হয়ে ওঠে। ব্যক্তিগত এই গুণাবলী ও সামাজিক অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকলেও অপরাধ করার জন্য তার মনের ভেতর যে প্রস্তুতি আসে, সম্মতি আসে, তা নিয়ন্ত্রণ করে তার একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী। অপরাধের পথে এগিয়ে যাওয়ার সময়ে তার ঐ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীই তাকে তার কাজের পক্ষে ইন্ধন যোগায়, যুক্তির সন্ধান দেয়, চিন্তাকে অপরাধমূলক কার্যসিদ্ধির অনুগামী করে তোলে। সমাজানুগ দৃষ্টিভঙ্গীতে জনস্বার্থ উপেক্ষিত নয়, বরং প্রয়োজনীয় গুরুত্বের সঙ্গে তা বিবেচিত হয়। কিন্তু সমাজবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যক্তিবিশেষের বা মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির স্বার্থ অগ্রাধিকার পায়। সম্পূর্ণ ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিক এই দৃষ্টিভঙ্গী অথবা রুচিবিকৃতির কারণ যাই হোক না কেন, এরই প্রভাবে মানুষ অপরাধমূলক আচরণে লিপ্ত হয়, এবং ক্রমশ অভ্যস্ত হয়। **দৃষ্টিভঙ্গীর এই পরিবর্তন মানুষের মনোজগতের একান্ত ব্যক্তিগত ঘটনা।**—উক্ত দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন ব্যক্তির (বা ব্যক্তিদের) যুক্তি, অভীষ্টসাধন পদ্ধতি, বাধা অপসারণের কৌশল, জীবনধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় উপকরণের সংগ্রহরীতি, উচিতানুচিত বোধ, ইত্যাদি

সামাজিক বিধিনিষেধগুলির উত্তরোত্তর বিরোধী হয়ে ওঠে। পরিণামে উক্ত ব্যক্তির (বা ব্যক্তিদের) সংশ্লিষ্ট আচরণগুলি অধিকাংশক্ষেত্রে দণ্ডনীয় হয়ে ওঠে। দৃষ্টিভঙ্গীর এই পরিবর্তন হঠাৎ আসে না; সহসা পরিস্ফুট বা লক্ষণীয় হয়ে উঠলেও এর একটি ইতিহাস থাকে যা অনুধাবন সাপেক্ষ।

অপরিণত বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ অপরের প্ররোচনায় এবং পরিকল্পনায় পরিণাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকে যন্ত্র হিসাবে অপরাধমূলক আচরণ করতে পারে। মানসিক অসুস্থতার প্রভাবে অসুস্থ ব্যক্তি ঝোঁকের বশে অপরের অসতর্কতার সুযোগে কোনো অবাঞ্ছনীয় কাজ করে ফেলতে পারে। কিন্তু উক্ত দুটি ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত লাভ-লোকসান বা জীবিকার প্রশ্ন জড়িয়ে থাকে না—এরা দণ্ডনীয় কাজের সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে ফেলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এদের অপরাধ প্রমাণ করবার জন্য জটিল অনুসন্ধান পদ্ধতির বা বিচার পদ্ধতির সাহায্য নিতে হয় না। না-বুঝে অপরাধ করা বা অসুস্থতার ঝোঁকে অপরাধ করাকে সমাজবিরোধী আচরণ হিসাবে আখ্যা দেওয়া যায় না। কিন্তু এমন অপরাধীর সংখ্যা নেহাৎ নগণ্য নয়, যারা খুব সংযতভাবে নিজের লাভ-লোকসানের সম্বন্ধে সচেতন থেকে সুপরিকল্পিত প্রণালীতে জীবিকার উদ্দেশ্যে অপরাধমূলক আচরণ করে, ধরা পড়ে, দণ্ডভোগ করে, এবং মুক্তি পেয়ে পুনরায় অপরাধ করে যায় যতদিন না আবার ধরা পড়ে। এদের বুদ্ধি প্রখর এবং মন সম্পূর্ণ সুস্থ ব্যক্তির মতোই কার্যক্ষম; এদের দৃষ্টিভঙ্গীতে অপরাধমূলক আচরণ গর্হিত বলে মনে হয় না বরং স্বাভাবিক এবং নৈপুণ্যের পরিচায়করূপে স্বীকৃতি পায়। এই স্বভাব-অপরাধীরা নিজেদের বুদ্ধির প্রয়োগে সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করে নিয়ে আত্মরক্ষায় প্রস্তুত হয়ে স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যে-কোনো সময়েই অপরাধ করতে পারে। এদের অতীতের ইতিহাস পর্যালোচনা না-করলে, কেন তাদের দৃষ্টিভঙ্গী অসামাজিক হয়ে উঠল, তা বোঝা যায় না; কিভাবে তারা ক্রমশ সমাজ-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল, তার রহস্য ভেদ করা যায় না। দণ্ডভোগের সময়ে আচরণ সংস্কারের কোনো প্রচেষ্টা এদের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয় না। স্বভাব-অপরাধীদের (অতীত জীবনের ঘটনা

অনুধাবন করে) সুস্থ সমাজ-জীবন থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে জীবনযাপনের প্রচেষ্টার উপর প্রভাব বিস্তারকারী তথ্যগুলিকে, আলোচনার সুবিধার্থে, দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের একটি রেখাচিত্র সন্নিবেশিত করা হল।

উক্ত রেখাচিত্র নিরীক্ষণ করলে বুঝতে পারা যাবে যে দুর্ভাগ্যবশত এরা সামাজিক পরিবেশের সুস্থ প্রভাব থেকে আশৈশব বঞ্চিত। সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার বিভিন্ন ক্ষেত্রে এরা স্বীয় পরিবার, পরিজন, প্রতিবেশী, এবং সমাজের কাছ থেকে রুক্ষ, হৃদয়হীন ও বেদনাদায়ক ব্যবহার পেয়ে এসেছে। নিজেদের অক্ষমতার জন্যে এদের অভিভাবকেরা অভাবের ঘূর্ণীপাকে এদের জড়িয়ে ফেলে স্বেচ্ছাচারে জীবন ধারণের শিক্ষা দিয়েছে। উচিত-অনুচিতের শিক্ষণ সময়ে পরিবেশের প্রতিকূল প্রভাবে অবাঞ্ছিত মতিগতিকে অনুকরণ করবার এরা যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছে, এবং বিপথগামী হয়ে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট প্ররোচনাও পেয়েছে। গ্রাসাচ্ছাদনের প্রচণ্ড তাগিদে, অভাব-অনটনে দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে এরা পরিবেশ থেকে যা আশা করেছে তার কিছুই সহজ ভাবে পায় নি। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে, উচ্ছৃঙ্খলতার প্রভাবে, প্রতিবেশীদের ঔদাসিন্যে, সমবয়সীদের অবজ্ঞায় এদের মনের ভারসাম্য বার বার বিপর্যস্ত হয়েছে—পুঞ্জীভূত অবমাননা, অনাদর, অবহেলার প্রতিক্রিয়ায় এদের মনে ঈর্ষা, প্রতিশোধস্পৃহা, অর্থলিপ্সা প্রকট হয়েছে। কৈশোরের বন্ধনহীন, অবমানিত, অনাদৃত অবহেলিত জীবনে স্বাবলম্বনের পথে উপযুক্ত নির্দেশ ব্যতিরেকে এগিয়ে যেতে গিয়ে এরা না-বুঝে স্বেচ্ছাচারের পথেই এগিয়ে গেছে, এবং এই সময়েই পাকেচক্রে এরা স্বভাব-অপরাধীদের সান্নিধ্যে এসে অপরাধমূলক আচরণের শিক্ষা পেয়েছে; প্ররোচনায়, প্রলোভনে, এদের ভারসাম্যবিহীন মন সহজভাবে গ্রাসাচ্ছাদনের সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে সন্দেহজনক উপায়ে গর্হিতভাবে উপার্জনের প্রচেষ্টায় সায় দিয়েছে। বয়ঃসন্ধির সময় যখন দেহ ও মনে দ্রুত পরিবর্তন চলে (পরিপূর্তির উদ্দেশ্যে) তখনই সামাজিক পরিবেশের মিথস্ক্রিয়ার প্রভাবে মানুষের বুদ্ধিতে পাক ধরে,

দৃষ্টিভঙ্গী মানুষের আচরণকে পথ-নির্দেশ দেয়, নীতিবোধ দৃঢ় হতে থাকে, মানুষ একটা আদর্শকে আঁকড়ে ধরে চলতে চায়। জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ এই সন্ধিক্ষণে সমাজ-জীবন থেকে ছিন্ন হয়ে গিয়ে, ছন্দ-ছাড়া পথে স্বভাব-অপরাধীদের কাছে গর্হিত জীবন-যাপনের দীক্ষা পেয়ে এরা তাদের নির্দেশমতো চলতে গিয়ে প্রথম দণ্ডভোগ করেছিল। দণ্ডভোগের সময়ে আচরণ-সংস্কারের কোনো প্রভাব এদের দৃষ্টিভঙ্গীতে আমূল পরিবর্তন আনতে পারেনি, কারণ (অতীতের অভিজ্ঞতার বিচারে), সুস্থ সমাজ-জীবনে প্রত্যাবর্তনের আশ্বাসবাণী এবং তদুপযোগী শিক্ষাদীক্ষা এদের কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়েছিল। দণ্ডভোগের পর শিক্ষাদীক্ষা-উপজীবিকাহীন কিশোর মনে সুস্থ সমাজ-জীবনে প্রত্যাবর্তনের সাধ থাকলেও প্রতিকূল বাস্তবের বাধাগুলিকে অতিক্রম করার সুযোগ-সুবিধা তাদের ছিল না। অগত্যা ছন্দ-ছাড়া পথে গ্রাসাচ্ছাদনের সাদর আহ্বানকে তাদের মন উপেক্ষা করতে পারে নি, বাঁচার তাগিদে তারা স্বাভাবিক সুস্থ সমাজ-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বভাব অপরাধীদের সমাজে স্থায়ীভাবে আশ্রয় চেয়েছিল। ঐ সমাজে তারা কেবল আশ্রয় পায়নি, স্বীকৃতি, আত্মতৃপ্তি, বন্ধুত্বের মর্যাদা, অবাধ যৌনসুখ. এবং আর্থিক সঙ্গতি লাভ করেছিল—গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান ছাড়াও সাধারণতঃ মানুষ যা চায়। পরিণতিতে এরা ক্রমশ অপরাধকে এদের জীবিকা নির্বাহের উপায় হিসাবে বেছে নিয়েছিল। মাঝে মাঝে দণ্ডভোগ করবার সময়ে স্বাভাবিক সমাজ-জীবনে প্রত্যাবর্তনের কথা মনে পড়ে গেলে প্রথম প্রথম দুঃখ, অবসাদ, অন্তর্দ্বন্দ্ব, বিমর্ষতা এদের মনকে ভারাক্রান্ত করলেও ধীরে ধীরে ঐগুলির প্রভাব থেকে তাদের মন মুক্ত হয়েছিল—দৃষ্টিভঙ্গীর স্থায়ী পরিবর্তনে। যে সমাজ-জীবনে প্রত্যাবর্তনের পথে দুস্তর বাধা সেই সমাজ-জীবন থেকে নিজেদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে তারা এমন একটি সমাজ-জীবনে স্থায়ীভাবে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল যেখানে তারা সাদরে অভ্যর্থিত, সম্পূর্ণ বাঞ্ছিত এবং সমাদৃত।

সামাজিক পরিবেশের শান্তি, শৃঙ্খলা এবং সমাজ-জীবনের নিরাপত্তার

অধিকার একটি অনুমোদিত শাসনযন্ত্রের উপর ন্যস্ত থাকে। সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থিত এই শাসনযন্ত্র সামাজিক শৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধাবান জনসাধারণের নিরাপত্তা ও স্বস্তির জন্য অপরাধীকে দণ্ড দেবার অধিকার পেয়েছে। বর্তমানে দণ্ডদানের মুখ্য উদ্দেশ্য হল দণ্ডভোগের সময়ে অপরাধীর দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তন এনে তাকে অপরাধমূলক আচরণের প্রতি বীতস্পৃহ করে তোলা—যার ফলে সে ছন্দ-ছাড়া সমাজ-জীবন ছেড়ে আবার সুস্থ স্বাভাবিক সমাজ-জীবনের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে চলতে পারে।

আধুনিক দণ্ডনীতি প্রতিশোধস্পৃহার প্রভাবমুক্ত হয়ে ক্রমশ মানব কল্যাণের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে; যার উদ্দেশ্য হবে আচরণ-সংস্কারের ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধার সার্থক রূপায়ণ, বাঞ্ছিত সমাজ-জীবনে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে দণ্ডাধীন অপরাধীর সম্ভাব্য আচরণ সংস্কার। মানসিক অসুস্থতার প্রভাবে যদি কোনো ব্যক্তি দণ্ডনীয় আচরণ করে সেক্ষেত্রে, অভিযুক্ত হবার পর উক্ত দণ্ডনীতি অনুযায়ী, তাকে অবিলম্বে কোনো অনুমোদিত মনোরোগ চিকিৎসা-কেন্দ্রে পাঠাতে হবে যেখানে মনোরোগ চিকিৎসকের উপযুক্ত নির্দেশে ও তত্ত্বাবধানে তার মানসিক অসুস্থতার চিকিৎসা হতে পারে। এই ক্ষেত্রে মনের সুস্থতার সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের প্রশ্নটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকে। সুচিকিৎসিত না-হয়ে শুধু কারাগারে বন্দী হিসাবে কিছু সময় থাকলে বা দণ্ডভোগের সময়ে তাকে অন্য কোনো কাজের মাধ্যমে আচরণ সংস্কারের চেষ্টা করলে সাময়িকভাবে তাকে অপরাধমূলক আচরণ থেকে নিরস্ত করা সম্ভব হলেও উত্তরকালে সুস্থ সমাজ-জীবনে তার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যাবে না। এই ধরনের অপরাধীর আচরণ-সংস্কারের জন্য সুচিকিৎসার ব্যবস্থাই একমাত্র নীতি হওয়া উচিত। অনুরূপভাবে স্বভাব-অপরাধীদের সংসর্গ থেকে অপরিণত বুদ্ধিসম্পন্ন অপরাধীদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে কোনো বিশেষ সংশোধন কেন্দ্রে চিকিৎসার সঙ্গে মনোবিজ্ঞানসম্মত উপায়ে যতদূর সম্ভব কাজের উপযোগী করে তোলার প্রচেষ্টায় কিছুটা সুফল নিশ্চিতভাবে আশা করা যেতে

পারে। এদের মধ্যে যারা বাল্যকাল থেকেই স্বভাব-অপরাধীদের সংসর্গে ছিল তাদের আচরণে কতটা পরিবর্তন আনা সম্ভব সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহে কিছু বলা চলে না। কারণ, এদের ক্ষেত্রে আচরণ সংস্কারের সাফল্য নির্ভর করবে তাদের মানসিক পরিপূর্তি কতটা কতদিনে হবে তার উপর। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিরাশ' হবার সম্ভাবনা থাকলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত সাফল্যের আশা নির্দ্বিধায় করা যেতে পারে।

সুস্থ সমাজ-জীবন যাপনের সহায়ক দৃষ্টিভঙ্গী এবং আচরণ সংস্কারের সম্ভাবনার দিক থেকে বিচার করলে দেহের ও মনের বৃদ্ধি ও পরিপূর্তি এবং সুস্থতা যদি স্বাভাবিক থাকে তাহলে পাকেচক্রে অপরাধ করার পর দণ্ডভোগের সময়ে অপরাধীর দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করা এবং আচরণকে আশানুযায়ী সংস্কৃত করার প্রতিটি বিজ্ঞানসম্মত প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হতে পারে। কিন্তু এই ধরনের সহজ ও স্বাভাবিক মনের গঠন থাকা সত্ত্বেও কৈশোরের শুরু থেকে যে-সব ছেলেমেয়ে ঘটনাচক্রে স্বভাব-অপরাধীদের সংসর্গে আসে, এবং ঐ সংসর্গকে নিরাপদ আশ্রয়রূপে স্বীকার করে নেয়, তাদের ঐ সংসর্গ-কাল যত দীর্ঘ হয় ততই তাদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করার সম্ভাবনা বা আচরণ সংস্কারের সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত হয়। কারণ, কোনো ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা আগ্রহের অভাব থাকলে প্রহরাধীন অবস্থায় বলপ্রয়োগে বা ঔষধের প্রভাবে সাময়িকভাবে তার আচরণ আয়ত্তে আনা গেলেও সহজ, স্বাভাবিক ও মুক্ত অবস্থায় তাদের মতিগতি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া চলে না। সুতরাং দৃষ্টিভঙ্গীকে সমাজানুগ করে পুনরায় গড়ে তোলার জন্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির (দণ্ডাধীন অপরাধীর) ইচ্ছা এবং আগ্রহ। এই ইচ্ছার এবং আগ্রহের অভাব থাকলে আধুনিকতম আচরণ-সংস্কারের ব্যবস্থাগুলিকেও কোনো মতে কাজে লাগানো যাবে না। আত্মহত্যার এমন নজীর আছে যেখানে মানুষ নিজেকে ঠিক যে-ভাবে মারতে চায়, সেই ধরনের সুযোগ-সুবিধার অপেক্ষায় থাকে বা তা সৃষ্টি করে নেয়, এ ক্ষেত্রেও তার ইচ্ছার তীব্রতা এবং আধিক্য লক্ষণীয়। এদের নিরন্ত

করা সম্ভব নয়, একবার বাধা পেলে এরা অপর একটি সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। কিন্তু সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলতে না পেরে, জীবন, যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হয়ে সাময়িকভাবে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে, যারা ঝোঁকের মাথায় বা উত্তেজনার বশে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয়, তারা একবার বাধা পেলে (বা তাদের প্রথম চেষ্টা সফল না হলে) আর ও পথে যেতে চায় না—সংবিৎ ফিরে পায় ; এরা বাঁচতেই চায় তাই নিজের ভুল বুঝতে পারবার পর নিজের আচরণে নিজেই লজ্জা পায়। বাঁচার আগ্রহ যে রুগীর নেই, সেখানে চিকিৎসার সাফল্যও সন্দেহাতীত হতে পারে না। ধর্মের ওপর যার আস্থা গভীর, তাকে ধর্মান্তরিত করা যত শক্ত, যার আস্থা নেই তাকে ধর্মান্তরিত করা তত সহজ। স্বধর্মে বিশ্বাসী লোক প্রাণের দায়ে বিধর্মী হতে পারে, কিন্তু পরিবেশ যখন আবার সহজ হয়, সে স্বধর্মের প্রতি পুনরায় আনুগত্য দেখায়। কিন্তু সম্মান, প্রতিষ্ঠা, অথবা স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির প্রলোভনে যারা বিধর্মী হয়, স্বধর্মের প্রতি তাদের আনুগত্য আর ফিরে আসে না—অধিকন্তু, যে ধর্ম তারা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করে আসে সেই ধর্মের প্রতি তাদের বিদ্বেষ এবং ঘৃণা কল্পনাতীত ভাবে প্রকট হয়—প্রকাশ পায়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে কালাপাহাড়-সুলভ স্বধর্ম-বিদ্বেষের নজীর অসংখ্য না-পাওয়া গেলেও বিরল নয়। স্বভাব-অপরাধীর বা কোনো বিশেষ লক্ষ্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার পরিণামে সমাজবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী যার এসেছে, তার ক্ষেত্রেও ঐ একই কারণে সমাজের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা কল্পনাতীত ভাবে প্রকট হয়ে ওঠার পর পুনরায় সুস্থ স্বাভাবিক সমাজ-জীবনে পুনর্বাসন বা প্রত্যাবর্তনের বিষয়টিতে অসাফল্যের সম্ভাবনা বিশেষভাবে জড়িয়ে থাকে। অবশ্য আচরণ-সংস্কারের আদর্শের শেষ কথা হিসাবে উক্ত বিষয়টিকে কেউ রাখতে চাইলে বলার কিছু নেই ; কারণ আদর্শ সব সময়েই দুর্লভ।

আচরণ সংস্কারে নিরাসক্ত দণ্ডাধীন অপরাধীর কাছে আচরণ সংস্কারের প্রতিটি সুব্যবস্থাই মানসিক নির্যাতন মনে হওয়ায় উদ্যোক্তাদের বা সংশ্লিষ্ট কর্মীদের সমস্ত চেষ্টা পণ্ডশ্রমে পরিণত হয়। এই পরিণতির

ফলে স্বভাব-অপরাধীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সুতরাং অপরাধী এবং অপরাধের সংখ্যা হ্রাস করতে গেলে, মানুষের মনে তার সমাজ-জীবনে অপরাধ-স্পৃহার উদ্দীপক অবস্থাগুলিকে জানতে হবে, বুঝতে হবে, এবং সেগুলিকে আয়ত্তে রাখার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অপরাধীদের সমাজ-জীবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য সমগ্র সমাজের দৃষ্টি-ভঙ্গীকেও আচরণ সংস্কারের উদ্দেশ্য এবং সার্থকতার অনুকূলে গড়ে তুলতে হবে। এই প্রচেষ্টার সঙ্গে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জড়িয়ে রয়েছে—সেটি হল, আচরণ সংস্কারের উদ্দেশ্যে কারাগারের আবাসিক হিসাবে দণ্ডাধীন ব্যক্তিদের শ্রেণী বিভাগ—যাদের মধ্যে সমাজ-জীবনে পুনরায় ফিরে যাবার ইচ্ছা এবং আগ্রহ আছে, তাদের সেই আগ্রহের তারতম্য অনুসারে পৃথকীকরণ। ঘটনাচক্রে বা প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশের চাপে পড়ে একবার অপরাধ করে ফেলেছে বা ছন্দ-ছাড়া পথে চলে যাবার চেষ্টা করেছে, এমন ব্যক্তির সব গুণ বা পারঙ্গমতা অপরাধ করার জন্য নষ্ট হয়ে যায় না, হয়তো অপপ্রযুক্ত হতে পারে। দণ্ডাধীন ব্যক্তিদের শ্রেণী-বিভাগের জন্য এই বিষয়টিও যথাযথভাবে নিরূপিত হওয়া দরকার। সুতরাং এই শ্রেণী-বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া উচিত সেই ধরনের বিশেষজ্ঞদের, যাঁরা বিশেষ বিশেষ অভীক্ষার মাধ্যমে ওই সম্ভাবনা বা বিশেষত্বগুলিকে ঠিক মত ধরতে পারেন। আইনের সাহায্যে এই কাজ সম্ভব নয়, মনোব্যাধি চিকিৎসার পদ্ধতিতেও এই কাজ অসম্ভব। বর্তমানে বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্রের মতো মানসিক অভীক্ষার সাহায্যে ঐ সকল বিষয়ের সঠিক মূল্য নির্ণয় করবার কলা-কৌশল ফলিত মনোবিজ্ঞানীরা করায়ত্ত করবার মানসে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন।[১]

সম্প্রতি একটি বিশেষ ধরনের অপরাধীদের নিয়ে সমাজ ও

১। পশ্চিমবঙ্গের কারাবিভাগের কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে সম্প্রতি সচেতন হয়ে একটি আদর্শ প্রকল্প রচনার উদ্দেশ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত মনোবিজ্ঞান বিভাগের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছেন—আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এঁদের এই যুগ্ম প্রচেষ্টা আমাদের দেশের সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে একটি গৌরবময় বলিষ্ঠ পদক্ষেপরূপে স্বীকৃতি পাবে।

শাসন কর্তৃপক্ষকে বিব্রত হতে হচ্ছে—এরা ঠিক মানসিক রোগেও অসুস্থ নয় অথচ স্বভাব-অপরাধীও নয়—এরা সাময়িক উত্তেজনার বশে বিভিন্ন প্রকারের নাশকতামূলক অপরাধে নিজেদের জড়িয়ে ফেলেছে, এবং এদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধগুলিতে এদের মানসিক প্রতিক্রিয়াশীলতার ছাপ সুস্পষ্ট থাকে। সমাজ ও সংস্কৃতি নির্ধারিত বিশেষ বিশেষ বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অথবা উক্ত বিধি-ব্যবস্থার প্রয়োগকারীর বিরুদ্ধে একটি চরম পন্থা অবলম্বন করতে গিয়ে এরা অপরাধ করে—লাভ লোকসানের বিচার না-করে এরা শুধু এদের উত্তেজনা প্রশমিত হলেই তৃপ্তি পায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এদের প্রতিশোধ-স্পৃহার অভিব্যক্তি এতই উগ্র ও ভয়ঙ্কর যা স্বভাব-অপরাধীদেরও হতবাক্ করে দেয়। আপাতদৃষ্টিতে এদের মতি-গতির পরিবর্তনকে কোনো একটি আকস্মিক ঘটনার সঙ্গে জড়িত মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে মনের মধ্যে অনেক দিনের পূঞ্জীভূত আক্রোশ বা ব্যর্থতার গ্লানি এই পরিবর্তনের জন্য দায়া। এই পরিবর্তনকে মনের পুঞ্জীভূত গ্লানির বিস্ফোরণের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে—যা বিশেষ বিশেষ উত্তেজক ঔষধের প্রয়োগে অথবা তীব্র প্ররোচনা বা প্রলোভনের প্রভাবে মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার ফলে ঘটতে পারে। সাধারণতঃ সহ্যের সীমা পেরিয়ে মানুষের সম্মান বিপর্যস্ত হলে বা হওয়ার সম্ভাবনার মধ্যে বেশ কিছুদিন থাকলে সে অনন্যোপায় হয়ে এই ধরনের উত্তেজনা প্রকাশ করে থাকে। সুতরাং এই শ্রেণীর অপরাধীর এমন একটা অতীত আছে যা না-জানতে পারলে তাদের মানসিক উত্তেজনাকে হ্রাস করে মতিগতির ছন্দপতন রোধ করা যাবে না। এদের মনের বিচিত্র গতি যথার্থভাবে অনুধাবন না-করে শুধু অন্তরীণ অবস্থায় রেখে ভয় দেখিয়ে বা চাপ সৃষ্টি করে আচরণ সংস্কার করতে গেলে সব চেষ্টাই বৃথা যাবে—এই পণ্ডশ্রমের পরিণামে স্বভাব-অপরাধীদের পথ সুগম হবে ও কর্ম তৎপরতা বৃদ্ধি পাবে।

অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে আদালত অপরাধীকে দণ্ডভোগের নির্দেশ দেয়—এখানে আইনের বা যুক্তির প্রাধান্যই স্বীকৃতি পায়,

মানুষের মনের বিচিত্র গতির রহস্য প্রকৃতপক্ষে অপ্রয়োজনীয় হিসাবে অনাদৃত থাকে। আচরণ-সংস্কারের দৃষ্টিকোণ থেকে মনের বিচিত্র গতির রহস্য উদ্ঘাটন করাকেই প্রাধান্য দিয়ে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে, এবং এই স্বীকৃতির ভিত্তিতেই স্থির করতে হবে আচরণ-সংস্কার কেন্দ্রের আবাসিকরূপে কোন্ শ্রেণীর অপরাধী অগ্রাধিকার পাবে; কোন্ শ্রেণীর অপরাধী কারাগারের আবাসিকরূপে কতদিন থাকবার পর আচরণ-সংস্কার কেন্দ্রে প্রবেশাধিকার লাভ করবে অথবা আচরণ-সংস্কারের সম্ভাবনা বিলুপ্তপ্রায় হওয়ায় কারাগারের আবাসিক-রূপেই দণ্ডভোগ করে যাবে; এবং কোন্ শ্রেণীর অপরাধীর স্থান একটি বিশেষভাবে পরিকল্পিত মনোরোগ চিকিৎসা কেন্দ্রে হবে। এই ধরনের শ্রেণী-বিভাগ অপরাধের লঘুত্ব বা গুরুত্বের মানদণ্ডে নিরূপিত হবে না, আচরণ-সংস্কারের সম্ভাবনা বা অসম্ভাবনার মানদণ্ডেই তা নির্ধারণ করতে হবে। ঐ ধরনের শ্রেণী-বিভাগের জন্য একটি বিচার-মান (লেখকের কল্পনাপ্রসূত) পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে নিম্নে প্রদত্ত হল।

১। আচরণ-সংস্কার কেন্দ্রে যারা প্রবেশাধিকারপাবে তাদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য :

(ক) বয়স অনুযায়ী দৈহিক ও মানসিক পরিপূর্তির মান যাদের স্বাভাবিক, এবং যারা বাতুল নয়।

(খ) ঘটনাচক্রে, অনন্যোপায় হয়ে, অপরাধমূলক আচরণে প্রথমবার লিপ্ত হওয়ায় যারা অভিযুক্ত হয়েছে, এবং নিজের অপরাধ স্বীকার করে দণ্ডাদেশ মেনে নিয়েছে।

(গ) অনুতাপ ও অনুশোচনার মাত্রা যাদের বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

(ঘ) পরিবার ও প্রতিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক যাদের সহজ, স্বাভাবিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ।

(ঙ) যাদের আচরণে এমন কোনো ভাব নেই যা সামাজিক পরি-বেশের সঙ্গে মানিয়ে চলার পক্ষে প্রতিবন্ধক।

(চ) ফলিত মনোবিজ্ঞানীদের দ্বারা নির্ধারিত বিভিন্ন অভীক্ষায় নির্দ্বিধায় যারা অংশ গ্রহণ করেছে, এবং অতীতের ঘটনা বা

অপরাধমূলক আচরণের প্রভাবী কারণগুলি অকপটে স্বীকার করেছে।

(ছ) সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী (কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিকূল হলেও) যাদের মোটের উপর অনুকূল (বীতস্পৃহ নয়)।

(জ) পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখী সমাজ-জীবনের আকাঙ্ক্ষা যাদের সুপরিস্ফুট (অভীক্ষার মাধ্যমে নির্ধারণ করতে হবে)।

২। আচরণ-সংস্কার কেন্দ্রে থাকাকালীন আবাসিক-জীবনের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য (প্রথম তিন মাস থাকার পর) ঃ

(ক) আবাসিকরূপে যে সমস্ত নিয়মগুলি পালনীয় যারা সেগুলি নির্দ্বিধায় পালন করে (আচরণ-সংস্কার যাঁরা করাবেন তাঁদের মাপকাঠিতে) কি না ?

(খ) আবাসিকরূপে যে কর্মসূচীতে নিযুক্ত করা হয় যারা তা আগ্রহের সঙ্গে অনুসরণ করে (আচরণ-সংস্কার কেন্দ্র-প্রধানের মাপকাঠিতে) কি না ?

(গ) ফলিত মনোবিজ্ঞানীদের দ্বারা নির্ধারিত আচরণ-মান নির্ণয় অভীক্ষার ফল (উত্তরোত্তর) যাদের সন্তোষজনক/অসন্তোষজনক।

৩। শ্রেণী নির্ণয় ঃ

প্রথম শ্রেণী/দ্বিতীয় শ্রেণী/তৃতীয় শ্রেণী।

৪। মন্তব্য ঃ

আচরণ সংস্কারের সম্ভাবনা আশাপ্রদ/আরো তিনমাস পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন।

আচরণ-সংস্কার কেন্দ্রে নিয়ন্ত্রিত একটি কর্মমুখর সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এখানে আবাসিকদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী কর্মব্যস্ত করে রাখার সুযোগ এবং রুচি ও আগ্রহ ভেদে অবসর-বিনোদনের সুযোগ থাকবে। পরিবারের প্রিয়জন, বন্ধুবান্ধব, এবং

প্রতিবেশীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিধিনিষেধ বলবৎ থাকলেও বাধা থাকবে না—যাতে আবাসিক জীবনের প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব, এবং উপকারিতা সম্পর্কে আত্মীয়-পরিজন ও প্রতিবেশীরা ওয়াকিবহাল হতে পারে। অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় আইনের বিশেষ ধারা অনুযায়ী যতদিন দণ্ডভোগের নির্দেশ দেওয়া থাকবে সেই নির্দেশ আচরণ-সংস্কার আশানুরূপ হওয়া সত্ত্বেও শিথিল করা হবে না। এইজন্য আচরণ-সংস্কার বিশেষজ্ঞরা সম্মিলিত ভাবে পরামর্শ করে দণ্ডভোগের স্থায়িত্ব অনুযায়ী আবাসিকভেদে কর্মসূচীর প্রকল্প করে দেবেন—যাতে প্রতিটি আবাসিক ঐ সময়ের মধ্যে উত্তরকালের অভিপ্রেত সমাজ-জীবনের জন্য যথোপযুক্তভাবে নিজেদের যোগ্য করে নিতে পারে। এই কর্মসূচী-প্রকল্পে (উপযুক্ত অবস্থায় আসবার পর) আবাসিকের আচরণের পরিবর্তন কতটা নির্ভরযোগ্য তা পরীক্ষা করার জন্য বিশেষজ্ঞরা আবাসিককে তার পরিবার ও প্রতিবেশের মধ্যে জীবনযাপনের সুযোগ, তাঁদের ইচ্ছা অনুযায়ী, দেবার অধিকারী থাকবেন—অবশ্য এই সুযোগ মাঝে মাঝে অল্প সময় বা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময়ের জন্য দেওয়া হবে। প্রত্যেকটি আবাসিক তার নির্দিষ্ট প্রকল্প অনুযায়ী (যা তার জীবনের পক্ষে বিশেষ অর্থপূর্ণ ও মূল্যবান) আবাসিক জীবন শেষ করলে, আচরণ-সংস্কার কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ তার গুণ, দক্ষতা, বিশেষ পারদর্শিতা এবং আচরণের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে অভিমত-পত্রটি দেবেন, তা যেন তার সমাজ-জীবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিটি সম্ভাব্য প্রতিবন্ধক দূর করতে সাহায্য করে, সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে সক্রিয় ও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে—এ বিষয়ে শাসনতন্ত্রের তন্ত্রধারকদের গুরুত্বপূর্ণ অনুমোদন থাকা সর্বতোভাবে যুক্তিযুক্ত। শিক্ষা, কর্মসংস্থান, কর্মক্ষেত্রে পুনর্নিয়োগ, উপজীবিকা গ্রহণ, এবং নাগরিক হিসাবে সকল রকমের সুযোগ-সুবিধা লাভ করার ক্ষেত্রে ঐ অভিমত-পত্রটির সার্থক প্রয়োগ না-হলে আচরণ সংস্কারের স্বপ্ন সফল হতে পারে না।

দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত প্রতিটি অপরাধীকে আচরণ-সংস্কার কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞ-গণ পরীক্ষা করবার সুযোগ যাতে পান, সে-দিকে শাসন কর্তৃপক্ষের

সতর্ক দৃষ্টি প্রয়োজন। এই বিশেষজ্ঞগণের নিরপেক্ষ-নীতি নির্ধারিত মান নিরূপণের ভিত্তিতেই কারা কর্তৃপক্ষকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে অপরাধী কোন্ শ্রেণীর : (১) আচরণ-সংস্কার কেন্দ্রে প্রবেশাধিকারের উপযুক্ত

অথবা (২) মানসিক-চিকিৎসাকেন্দ্রে প্রবেশাধিকারের উপযুক্ত

অথবা (৩) কারাগারে আবাসিক হিসাবে থাকবার উপযুক্ত।

অবশ্য মানসিক-চিকিৎসাকেন্দ্রে সুচিকিৎসিত হবার পর চিকিৎসকের অভিমতের ভিত্তিতে ঐ ব্যক্তি আচরণ-সংস্কার কেন্দ্রের আবাসিকত্ব লাভ করতে পারে—যদি তার প্রবেশাধিকার লাভের যোগ্যতা এসে থাকে। অনুরূপভাবে কারাগারের আবাসিক কারা-অধ্যক্ষের অভিমতের ভিত্তিতে সময়মতো আচরণ-সংস্কার কেন্দ্রের আবাসিকত্ব লাভ করবার সুযোগ পেতে পারে। আচরণ-সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত বিশেষজ্ঞগণের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী এবং মতামতের উপর অন্য কোনো মত বা আদেশ যাতে সমস্যার সৃষ্টি না করে, সে-দিকে যথাসাধ্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা না থাকলে আচরণ-সংস্কারের সাফল্য আশাতীত ভাবে বিঘ্নিত হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থেকে যাবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, উক্ত শ্রেণী-বিভাগের পদ্ধতি রাজনৈতিক অপরাধে অথবা যুদ্ধ-অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবে কি না, তা চিন্তা ও আলোচনার বিষয়।

বিবর্তন প্রক্রিয়ায় মানুষের দৈহিক আকৃতিতে একটি স্থায়ী রূপ আরোপিত হয়েছে, যার ফলে দেহ-যন্ত্রের কর্ম-পদ্ধতি নির্দিষ্ট, নির্ভরযোগ্য এবং সুনিয়ন্ত্রিত, কিন্তু তার মানসিক গঠন (যা তার প্রকৃতি ও আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে) দেহের তুলনায় এখনো অনুন্নত। মানুষ তার দেহ সম্পর্কে প্রায় সব কিছু জানতে পেরেছে, কিন্তু মন সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে পারেনি—সুতরাং মনের গতিবিধিও তার পুরোপুরি আয়ত্তে আসেনি। যতদিন মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার অধিকাংশ তার কাছে অজ্ঞাত এবং অবোধ্য থাকবে ততদিন তার আচরণে সীমাহীন ত্রুটি-বিচ্যুতি হওয়ার সম্ভাবনাটিও জড়িয়ে থাকবে। তার মনের গতি বিচিত্র পথে বাঁক নিতে পারে, কখনো পশুত্বের প্রকাশে আবার কখনো দেবত্বের বিকাশে। মানুষ যতদিন না তার মনকে সম্পূর্ণভাবে জানতে, বুঝতে

ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে ততদিন পর্যন্ত মানুষের মধ্যে বিপথে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে, এবং কোনো কোনো মানুষ বিশেষ বিশেষ ঘটনার প্রভাবে সমাজ-জীবনে দণ্ডনায় আচরণ করে ফেলবে। বিপথ-গামী মানুষের সংখ্যা যাতে বৃদ্ধি না পায়, সে-জন্য সমাজ-নিয়ন্ত্রিত নিরাপত্তা-ব্যবস্থা এবং আচরণ-সংস্কার পরিকল্পনা যথাসম্ভব উন্নত ও বিজ্ঞানসম্মত করে তুলতে হবে। মানুষের চিন্তায়, বুদ্ধিতে, যুক্তিতে, বিচারে, সিদ্ধান্তে এবং মতবাদ বা তত্ত্বে যতদিন ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে ততদিন পর্যন্ত মানুষের ভুল পথে যাওয়ার ঘটনাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিলে আইন, ন্যায়-নীতি, চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং মনোবিদ্যা থেকে এমন কোনো একটি সহজ প্রতিবিধান পাওয়া যাবে না, যার সাহায্যে মানুষের মন থেকে অপরাধমূলক আচরণের সম্ভাবনাকে নির্মূল করা যেতে পারে। অপরাধমূলক আচরণের সূত্রপাত যখন মনের মধ্যেই হয়, তখন এই বিশ্বাসটুকু শুধু রাখতে পারা যায় যে দণ্ডিত ব্যক্তির মনের নাগাল পেলে, তার চিন্তাকে সমাজের প্রতি শ্রদ্ধাবান করে তুলতে পারলে, দণ্ডভোগের পর সে সমাজানুগ পথে সমাজের প্রতি অনুগত হয়ে, সমাজ-জীবনে অভিপ্রেত ছন্দের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে অপরাধীকে স্বাভাবিক সমাজ-জীবনে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। এই দায়িত্ব শুধু আচরণ-সংস্কার কেন্দ্রের কর্মীদের উপর ছেড়ে দিলে চলবে না—দেশের প্রতিটি নাগরিকের মনে এই বিশ্বাস থাকা চাই যে আচরণ-সংস্কার হওয়া সম্ভব। কারণ আচরণ-সংস্কার কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষের অভিমত-পত্রসহ যে সুস্থভাবে সমাজ-জীবনে পুনর্বাসন চাইছে, তার কোনো-এক দুঃসময়ে হারিয়ে-যাওয়া ছন্দ ফিরে পাবার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠেছে, তাকে সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে অভ্যর্থনা জানাবার দায়িত্ব তার পরিচিত সকলের, তার প্রতিবেশীর, তার সমাজের—এই অভ্যর্থনায় বিন্দুমাত্র ভ্রুকুটি সর্বতোভাবে বর্জনীয়।

APARADH O APARADHI by Dr. SUKUMAR BASU : Rs. 12·00

ডঃ সুকুমার বসু
জন্ম : ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১

উত্তর কলিকাতার (বাগবাজার) বসু পরিবারে শ্রীযুক্ত বসুর জন্ম। মনোবিজ্ঞানের উপর গবেষণা কার্যের জন্য তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। বর্তমানে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত মনোবিজ্ঞান বিভাগের তিনি একজন অন্যতম অধ্যাপক। মনোবিজ্ঞান বিষয়ক ভারতের বিভিন্ন গবেষণা পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বসুর গবেষণামূলক নিবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়ে থাকে।

সম্প্রতি ডক্টর বসু পশ্চিমবঙ্গে ভারত স্কাউটস্ এবং গাইডস্ সংস্থার অন্তর্ভুক্ত উত্তর কলিকাতা শাখার ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনার পদে বৃত হয়েছেন।

অপরাধ ও অপরাধী
ডঃ সুকুমার বসু
রূপা
দাম : বারো টাকা